দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৭ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা।। ৯ মার্চ ২০১৫।। ২৪ ফাল্গুন - ১৪২১
website : www.eswastika.com

এবিভিপি'র উত্থানে রাজ্যের ছাত্র রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ ?

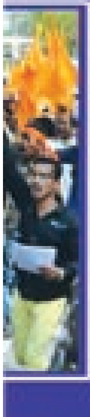

আহাম্মকের অহঙ্কার : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র .... পৃঃ ২৯

রাজনৈতিক দলের এজেন্ট হয়ে উঠেছে ছাত্র ইউনিয়নগুলি .... পৃঃ ৩১

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ২৮ সংখ্যা, ২৪ ফাল্গুন, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

৯ মার্চ - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৬,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

এই প্রথম ভোটে জেতার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাব করা হয়নি □ গূঢ়পুরুষ □ ১০

খোলা চিঠি : আজকে যে রাজা উজির, কাল সে মুকুল রায় □ সুন্দর মৌলিক □ ১১

শ্রীমোহন ভাগবত নির্জলা সত্য বলে মৌচাকে ঢিল মেরেছেন □ অমলেশ মিশ্র □ ১২

সাক্ষাৎকার : রাজনৈতিক চাপেই কলেজ ক্যাম্পাসে নোংরা রাজনীতি □ কিশোর বর্মন □ ১৪

এবিভিপি-কে আটকাতে নয়া সমীকরণ □ শুভাশিস রায় □ ১৬

বুদ্ধাবতার : আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ □ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার □ ২১

'বুনো' রামনাথের স্ত্রী □ ২৩

অর্থ কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে চলেছে □ অরবিন্দ পানাগড়িয়া □ ২৭

আহাম্মকের অহঙ্কার : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র □ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস □ ২৯

রাজনৈতিক দলের এজেন্ট হয়ে উঠেছে ছাত্র ইউনিয়নগুলি □ বরুণ দাস □ ৩১

রেলের স্বাস্থ্য ফেরানোর বাজেট □ দিব্যজ্যোতি চৌধুরী □ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৮** □ **খেলা : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট

বার্ষিক বাজেট শুধু একটি দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাবই নয়, সেই দেশের আর্থিক অবস্থার দর্পণ। গত এক বছরে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, পরিষেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বরাদ্দ অর্থের কতটা কি খরচ হয়েছে এবং আগামী এক বছরে এইসব ক্ষেত্রের অগ্রগতিতে কত টাকা বরাদ্দ করা হবে তারই একটা ছবি ফুটে ওঠে বাজেটে। এইবার মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। এই নিয়েই এবারের বিশেষ বিষয়। লিখেছেন— নারায়ণ চন্দ্র দে, অম্লান কুসুম ঘোষ, দিব্যজ্যোতি চৌধুরী।

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

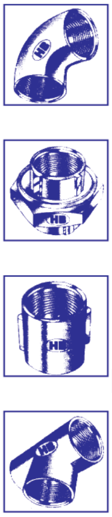

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE ®

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এই মুহূর্তে জম্মু-কাশ্মীর

দীর্ঘ টালবাহানার পর জম্মু-কাশ্মীরে পিডিপি-র সঙ্গে জোট বাঁধিয়া সরকার গঠন করিল বিজেপি। পিডিপি সুপ্রিমো মুফতি মহম্মদ সইদ মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি-র নির্মল সিং উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। শপথ গ্রহণ করিবার পর বিজেপি-র সঙ্গে জোট সরকারকে 'উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মেলবন্ধন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সইদ। জোটের পক্ষ হইতে প্রকাশিত অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে (সিএমপি) বলা হইয়াছে যে জম্মু-কাশ্মীরের জাতীয় পুনর্মিলনের স্বার্থে পিডিপি ও বিজেপি জোট সরকার গড়িয়াছে। ৩৭০ ধারা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে দুই দলই রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা মানিয়া চলিবে। আর যে সমস্ত স্থানগুলি হইতে আফস্পা প্রত্যাহার সম্ভব, সেই স্থানগুলি সন্ধান করা হইবে। বস্তুত, এই সরকার গঠন জম্মু-কাশ্মীরের মানুষের নিকট এক ঐতিহাসিক সুযোগ। রাজনৈতিক দলগুলিকে নিজেদের লাভ-ক্ষতির হিসাবকে বড় করিয়া না দেখিয়া এই সুযোগটিকেই বড় করিয়া দেখা দরকার। স্মরণ রাখিতে হইবে, জম্মু-কাশ্মীরকে রাজনৈতিক মূলস্রোতে সামিল করিবার লক্ষ্যে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শহিদ হইয়াছিলেন। সেইদিক হইতে এই সরকার গঠন ড. শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনও।

সত্যি কথা বলিতে কী, কেহই এমনকী ভারতীয় জনতা পার্টিও ২০১৪ সালের মে মাসের আগে পর্যন্ত কল্পনা করিতে পারে নাই যে, জম্মু-কাশ্মীরে তাহারা একটি রাজনৈতিক শক্তি হইয়া উঠিবে এবং রাজ্য সরকারের অংশীদার হইবে। আদর্শগত দিক হইতে দুই মেরুর হওয়া সত্ত্বেও পিডিপি-র সঙ্গে জোট বাঁধিয়া সরকার গঠন বিজেপি-র রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। এই প্রথম রাজ্যের প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে জম্মু প্রদেশ ও কাশ্মীর উপত্যকার মানুষের সমান অধিকার থাকিবে। জম্মু ও কাশ্মীরের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হইল বলা যায়।

লক্ষণীয় বিষয় হইল, পিডিপি ও বিজেপি জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় এখন ভারসাম্য বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিবে। দুই অঞ্চলের মানুষের উন্নয়ন ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিবে। এ যাবৎ যাহা হয় নাই। ইহা ব্যতীত রাজ্য ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিসভায় বিজেপি ও পিডিপি-র সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সাজ্জাদ লোনের পিপল কনফারেন্সের উপত্যকার দুইজন বিধায়কের সমর্থনও বিজেপি লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ বিধানসভায় পিডিপি এবং সঙ্গীদল-সহ বিজেপি-র বিধায়ক সংখ্যা সমান সমান।

জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপি-র ক্ষেত্রে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বিজেপি এখন শুধু জম্মু অঞ্চলের দল নহে, সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরের দল হিসাবে উন্নীত হইয়াছে। এই রাজ্য থেকে বিজেপি-র এখন চারজন সাংসদ রহিয়াছেন। দুই ডজনেরও বেশি বিধায়ক এবং জম্মু-কাশ্মীর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ৮ জন সদস্য। ইতিমধ্যেই কাউন্সিলে বিজেপি-র দুইজন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের একজন উপত্যকা এবং অন্যজন লাদাখ হইতে নির্বাচিত। অন্যভাবে বলা যায় রাজ্য বিধানসভায় তিনটি অঞ্চল হইতেই বিজেপি-র প্রতিনিধি রহিয়াছে। এই প্রথম একটি সরকার গঠিত হইল যাহা যতটা উপত্যকা-কেন্দ্রিক ততটাই জম্মু-কেন্দ্রিক। বস্তুত, বিজেপি জম্মু-কাশ্মীরে একরকম ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে।

একথা ঠিক, শপথ গ্রহণের পরেই মুখ্যমন্ত্রী মুফতি মহম্মদ জম্মু-কাশ্মীরে শান্তিপূর্ণভাবে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার জন্য পাকিস্তান ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলিকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, উভয় পক্ষেরই স্পর্শকাতর বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই সাহসী জোট বিক্ষিপ্ত জনাদেশকে সংগঠিত করিয়া একটি সম্প্রীতির সেতু নির্মাণের সুযোগ হিসাবে তাহা ব্যবহার করিতে পারে— ইহাই প্রত্যাশা। কেননা বিজেপি-পিডিপি জোট সংখ্যা হইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, দুই বিপরীত মেরুর এই জোট এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

সুভাষিত

শর্বরীভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ।
পৃথিবীভূষণং রাজা বিদ্যা সর্বস্য ভূষণম্।।
রাত্রির ভূষণ চাঁদ, নারীর ভূষণ তাঁর স্বামী এবং পৃথিবীর ভূষণ হলো রাজা। কিন্তু বিদ্যা সকলের ভূষণ।

জম্মু-কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ৫টি জেলায় সীমাবদ্ধ : অরুণ কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সম্পর্ক প্রমুখ অরুণ কুমার বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ সীমাবদ্ধ রয়েছে কেবলমাত্র পাঁচটি জেলায়। যে জেলাগুলি কাশ্মীরি ভাষী সুন্নি মুসলমান অধ্যুষিত। এই গোত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ও পিডিপি-নেত্রী মেহবুবা মুফতিও রয়েছেন। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি সঙ্ঘের এই বরিষ্ঠ প্রচারক নয়াদিল্লীতে '২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে সংসদের সর্বসম্মত প্রস্তাব' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন : জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখ--- 'তিনটি অঞ্চলের মধ্যে জম্মু ও লাদাখ— এই দু'টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। রাজ্যের ৮৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। যখন আপনি বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসঙ্গ তোলেন, তখন বলি আজ অবধি ভারতের বিরুদ্ধে এ নিয়ে কোনো প্রতিবাদ আন্দোলন হয়নি রাজ্যের ৮৫ শতাংশ এলাকায়।' উল্লেখ্য, শ্রী অরুণ কুমার ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ জুড়ে দক্ষিণবঙ্গ ঘুরে গেলেন।

অরুণ কুমার

তিনি আরো বলেন, 'মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মাত্র অংশ— কাশ্মীরি-ভাষী সুন্নি মুসলমান, আমি প্রায়শই টিভি চ্যালেন, সংবাদমাধ্যম এবং সাধারণ মানুষকেও বলি যে, আপনি যখন কাশ্মীর নিয়ে টিভি-তে কোনো বিতর্কসভা দেখেন, তখন কারা তাতে অংশ নেন? ওমর আবদুল্লা, মেহবুবা মুফতি, ইয়াসিন মালিক, সাব্বির শাহ, গিলানি, আসিয়া আন্দ্রাবি, লোন— এরা। প্রশ্ন এরা কারা? জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে কেবলমাত্র পাঁচটি জেলা— শ্রীনগর, বাঁদগাও, কুলওয়ামা, বারমুল্লা ও কুপওওয়ারা যেখানে এই কাশ্মীরি-ভাষী সুন্নি মুসলমানরা বাস করে। এরা প্রত্যেকেই সেখানকার।

তাঁর বক্তব্য, জম্মু-কাশ্মীরে প্রায় ১২ শতাংশ শিয়া মুসলমান, ১২-১৪ শতাংশ গুজ্জর মুসলমান এবং ৮ শতাংশের মতো পাহাড়ি রাজপুত মুসলমান বাস করেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়গুলি থেকে একজনও বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা পাওয়া যায়নি। তিনি যোগ করেন : 'যখন আফজল গুরুকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, তখন একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যম বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করে যেন গোটা রাজ্যটাই এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হলো ২২টি জেলার মধ্যে ১৭টিতে এ নিয়ে একটি ধরনাও হয়নি। যা হয়েছে তা ওই ৫ জেলায়।' এ বিষয়ে অরুণ কুমারের বক্তব্যও অত্যন্ত স্পষ্ট : 'পুঞ্চে ৯০ শতাংশ মুসলমান বাস করেন, কার্গিলেও ৯০ শতাংশ মুসলমান রয়েছেন, কার্গিল শহরে তো ৯৯ শতাংশেরও বেশি মুসলমান থাকেন... এই সব জায়গায় কিন্তু আফজল গুরুর ফাঁসি নিয়ে একটিও প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, গত ৬৮ বছর ধরে এখানে জাতীয়তাবাদ বনাম বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বৈরথ হয়ে আসছে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ এখানে কখনও হারায়নি কিংবা ভবিষ্যতেও হারাবে, এর কারণ এই রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই জাতীয়তাবাদী।

তিনি মনে করেন জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে আদতে কোনো বিতর্ক নেই। এটা দেশের আর পাঁচটা রাজ্যের মতোই। এই রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত একমাত্র বিষয় হলো, পাকিস্তান ও চীনের দখলে থাকা জম্মু-কাশ্মীরের একাংশ আমরা কীভাবে ফিরে পাব। তিনি এও বলেন যে, 'বিচ্ছিন্নতাবাদ', 'বিতর্ক', 'স্বশাসন'— জম্মু-কাশ্মীরের সঙ্গে সম্পর্কিত এই শব্দগুলি আসলে 'মিথ' ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন : 'জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কে আমাদের প্রচলিত ধারণা যে এটি একটি বিচ্ছিন্নতাকামী রাজ্য। যেহেতু জম্মু-কাশ্মীর নামোচ্চারিত হলেই প্রথমেই মনে আসে স্রেফ কাশ্মীরের কথা। কাশ্মীর মানে মুসলমান-কাশ্মীর আর মুসলমান-কাশ্মীর মানে বিচ্ছিন্নতাবাদী- কাশ্মীর, মূলত সেই কাশ্মীর যেখানে ভারতের তেরঙ্গা পতাকা পোড়ানো হয় এবং পাকিস্তানের পতাকা অনায়াসে ওড়ে।'

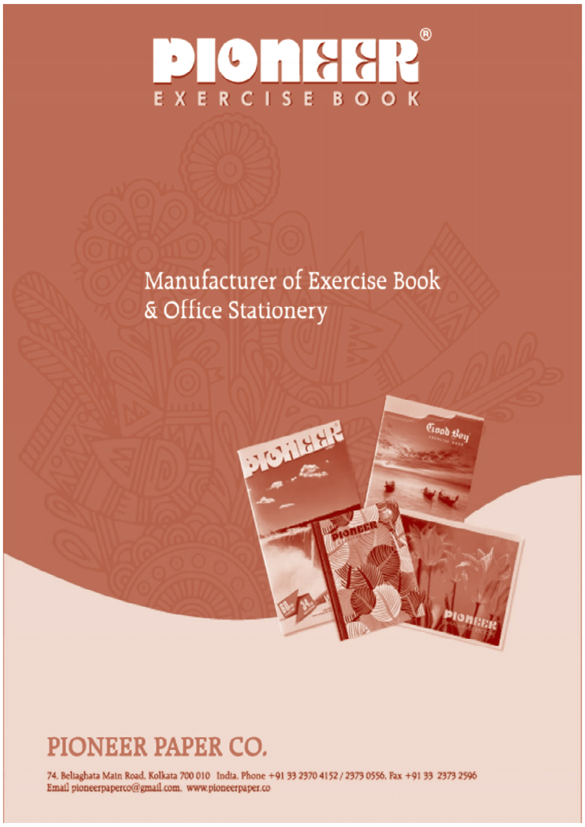

জম্মু-কাশ্মীরে ইতিহাস গড়ল বিজেপি

পিডিপি-র সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জম্মু-কাশ্মীরের ইতিহাসে এই প্রথমবার পি ডি পি-র সঙ্গে জোট বেধে সরকার গঠন করছে বিজেপি। ঠিক হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হবেন পিডিপি-র মুফতি মহম্মদ সঈদ। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর প্রায় দু'মাস ধরে উভয়পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষে যে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি স্থির হয়েছে তার প্রেক্ষিতে সরকার গড়তে কোনো বাধা নেই বলেই দুই শিবির থেকেই দাবি করা হয়েছে।

এমনিতে পিডিপি ও বিজেপি— দুই রাজনৈতিক দলের চরিত্রগত আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দু'পক্ষ মিলল মূলত বিজেপি নেতৃত্বের কৌশলী রাজনীতিতে। যেমন সংবিধানের ৩৭০ ধারা জারি রেখে দেওয়ার ব্যাপারে আগাগোড়াই সচেষ্ট ছিল পিডিপি। যে ধারা বলবৎ হওয়ায় রাজ্যের প্রতিরক্ষা, বিদেশ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আওতা অনেক শিথিল থাকে। উভয়েই আপাতত এর স্থিতাবস্থা রাখার ক্ষেত্রে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। কূটনীতিকরা মনে করছেন অগ্নিগর্ভ জম্মু-কাশ্মীরকে শান্ত করতে এই পদক্ষেপ বিশেষ কাজে দেবে। কারণ রাজ্যে ৩৭০ ধারা বলবৎ থাকলেও কেন্দ্রে ও জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে কোনো দেশ-বিরোধী কাজের সম্ভাবনা নেই।

পিডিপি-র দাবি ছিল আফস্পা (আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পওয়ার অ্যাক্ট বা এ এফ এস পি এ) প্রত্যাহার করতে হবে বছর খানেকের মধ্যে। বিজেপি বিষয়টিকে সেনার হাতে ছেড়েছে। তাদের বক্তব্য এনিয়ে সেনাবাহিনীর আপত্তি না থাকলে দল হিসেবে বিজেপি কোনো বাধা দেবে না। পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্কের দাবি তুলেছিল পিডিপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের সৌহার্দ্যপূর্ণ কথাবার্তা ও আসন্ন বিদেশ সচিব পর্যায়ের বাক্যালাপ স্মরণ করিয়ে এ ব্যাপারে পিডিপি-কে থামিয়ে দিতে পেরেছে বিজেপি। পিডিপি-র দাবি ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে। বিজেপিও দেখেছে সংবিধানের আওতায় থেকে এদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় থাকাই আপাতত শ্রেয়। তারপর তাদের প্রত্যাখ্যাত করার জন্য অপেক্ষা করা যাবে।

এহেন ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচিতে উভয় পক্ষ সহমত হওয়ার পরেই সরকার গঠনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, স্বাধীনতার পর থেকে জম্মু-কাশ্মীরের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মূলে রয়েছে সেখানকার রাজ্য-সরকারের পাক-পক্ষপাতমূলক মনোভাব। এবারে মোদী-ঝড়কে কাজে লাগিয়ে রাজ্য-রাজনীতিতে প্রথমবারের জন্য প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে বিজেপি। দেশের স্বার্থে জম্মু-কাশ্মীরে জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনের এই সুযোগ বিজেপি হাতছাড়া না করে সমীচিন কাজ করেছে বলেই কূটনীতিজ্ঞরা মনে করছেন।

বাংলাদেশে ২৮ হিন্দু পরিবারকে বন্দি করে নিগ্রহ, উদ্ধারের দাবি

প্রতিবেদক ॥ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা পটুয়াখালির রাঙাবালি মহকুমার একটি গ্রামে ২৮টি হিন্দু পরিবারকে বন্দি করে রেখেছে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসবাদীরা। শাসকদল আওয়ামি লীগের নামধারী দুষ্কৃতীরা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে রাঙাবালির বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নের কানাকুনিপাড়া গ্রামের দাসেরকান্দা পাড়ার ২৮টি সংখ্যালঘু পরিবারকে বন্দি করেছে। দুষ্কৃতীরা ওই সব পরিবারের বাড়িঘরে কয়েক দফা হামলা চালিয়ে মারপিট ও লুঠপাটও করেছে। এসব হিন্দু পরিবারের মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটেছে। ওইসব পরিবারের সদস্যদের বন্দি করে রাখায় থানায় গিয়ে তারা আইনের আশ্রয়ও নিতে পারছেন না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কিংবা প্রশাসনও অসহায় পরিবারগুলির রক্ষায় এগিয়ে আসেননি।

অসহায় ওই পরিবারগুলিকে অবিলম্বে উদ্ধারের দাবি জানিয়েছে সাম্প্রদায়িক বিরোধী সাংবাদিক মঞ্চ। রবিবার এক বিবৃতিতে তারা এই দাবি জানায়। কয়েকদিন দফায় দফায় নির্মম নির্যাতনে অসহায় হিন্দু পরিবারগুলি সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন মঞ্চের নেতারা। তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়ে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সাংবাদিক মঞ্চ অবিলম্বে পীড়িত ২৮টি পরিবারকে বন্দিদশা থেকে উদ্ধার, আহতদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানায়। একইসঙ্গে তাদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং রাজনৈতিক পরিসরের উর্ধ্বে উঠে হামলাকারী দুর্বৃত্ত ও মদতদাতাদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য হাসিনা সরকারের প্রতি জোরালো দাবি জানিয়েছেন মঞ্চের নেতারা।

মমতার ঢাকা সফর উদ্দেশ্য সফল হয়নি

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আগে বাংলাদেশ সফরে এসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাজিমাত করতে চেয়েছিলেন। সফরের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে নরেন্দ্র মোদীর আগে ঢাকা আসা, অন্যদিকে সারদা-খাগড়াগড় ষড়যন্ত্রে বিপর্যস্ত দল ও নিজের চেহারা মেরামত করা। মোদীর আগে ঢাকা সফরের লক্ষ্য আক্ষরিক অর্থে অর্জিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের মানুষ মোদীর সফরের দিকে আরও বেশি করে তাকাতে শুরু করেছে। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য একেবারেই সফল হয়নি। জামায়াতে ইসলামির জন্যে সারদার টাকা পাঠানো, তৃণমূল রাজ্যসভা সাংসদের ভূমিকা এবং খাগড়াগড় বিস্ফোরণে জামায়াতের আরেক সহযোগী সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদ্দিন বাংলাদেশের (এএমবি) সঙ্গে তৃণমূল নেতাদের জড়িত থাকার বিষয়গুলো নতুন করে বাংলাদেশের খবরের কাগজে এসেছে।

এই খাগড়াগড়ে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা তৈরি হচ্ছিল, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রায় ৫০ ঘণ্টার সফরে (১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত পর্যন্ত) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল লক্ষ্য ছিল একুশের প্রথম প্রহরে (মাঝরাতে) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। রাষ্ট্রপ্রতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরই তিনি ফুল দিয়েছেন ২১ জন সফরসঙ্গী নিয়ে। বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেছেন, গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন, শেখ হাসিনার সঙ্গেই মধ্যাহ্ন ভোজ সেরেছেন ইলিশ দিয়ে। দু'দেশের ব্যবসায়ীদের নিয়ে সভা করেছেন। আড্ডা দিয়েছেন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে, কবিতা পড়েছেন। ভারতীয় হাইকমিশনার পঙ্কজ শরণের বাসভবনে আয়োজিত সংবর্ধনায় মন্ত্রী-উপদেষ্টা, আওয়ামি লিগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (জামায়ত ছাড়া) নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের নেতৃবন্দের সঙ্গে আনন্দে মেতেছেন। দুই বাংলার শিল্পীরা গান গেয়েছেন। কবিরা কবিতা পড়েছেন। গোটা অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছেন মমতা। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আবেগতাড়িত হয়েছেন। কিন্তু যাঁর আমন্ত্রণে এই বাংলাদেশ সফর সেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলি চলে যান আমেরিকায় মার্কিন মুলুকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির সঙ্গে বৈঠক করতে। মমতার সঙ্গে দেখা হয়নি। মমতাকে বিমানবন্দরে স্বাগত ও বিদায় জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।

সীমান্ত সমস্যা নিয়ে আর জটিলতা নেই কেন্দ্রীয় সরকারের। স্থির হয়ে আছে লোকসভার এই অধিবেশনে পাস হচ্ছে ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি। তারপরও মমতা কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে আড্ডায় দাবি করলেন, সীমানা চুক্তি সমাধান করে দিয়েছি, তিস্তায়ও আস্থা রাখুন। কিন্তু শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে চুক্তি সইয়ের জন্যে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থ রক্ষার আগে কারিগরি সমস্যা মেটানোর কথা বলেন। অর্থাৎ সেই সাড়ে তিন বছর আগের অবস্থানে। কোনো নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করেননি। সেই তিস্তা ঝুলেই রইলো। তাহলে কেন ঢাকা সফরে এলেন? উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্র অঙ্গনের নামী-দামি তারকা ও সাবেক অভিনেত্রী, গায়ক, কবি, ব্যবসায়ীদের নিয়ে ঢাকা মাতাবেন। সঙ্গে থাকবে জামায়াত নেতা রাজ্যসভার সদস্য আহমেদ ইমরান। অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখি তিনি মারতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গে যে জামায়াত নেতাকে নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় তাঁকে সফরসঙ্গী করে বাংলাদেশকে জানান দেওয়া, যত বিতর্কই হোক ইমরানকে ছাড়ছি না। অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকারি নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বুদ্ধিজীবীদের এক কাতারে ইমরানকে বসিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে এই বার্তা দেওয়া, বাংলাদেশে যারা যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের বিচার করছে এবং জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছে, ইমরান তো তাদের পাশেই ছিল। নিয়ে গেলাম শহীদ মিনারেও, যেখানে জামায়াতের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়, ইমরানের আসার খবর শুনে বাংলাদেশে ক্ষোভ ও ধিক্কারের কারণে। সরকার অস্বস্তিতে পড়ে, সেটা দিল্লীকেও জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত ইমরান বধ হয়ে যায়। মমতাকে ঢাকা-দিল্লীর আঘাতটা হজম করতে হলো। ভাবমূর্তি উদ্ধারের ঢাকা সফর তো এবার বাতিল করা যায় না।

মমতা ঢাকা মাতানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক-রাজনীতিক সবাইকে নিয়ে গানে-কবিতায় মেতে উঠতে চেষ্টা করেছেন, ভুলটা করলেন শেখ হাসিনার কাছে ইলিশ চেয়ে। হাসিনা কৌতুকেই জবাব দিয়েছেন, তিস্তার জল ছাড়ুন, ইলিশ যাবে। হয়তো কৌতুকই, কিন্তু হুলটা তো আছে। মমতার সফরে তিস্তা নিয়ে এগোনোর খবর যখন নেই তখন সংবাদপত্রে গুরুত্বও কমে গেল। গুরুত্ব পেল ২ মার্চ নতুন পররাষ্ট্র সচিবের ঢাকা সফরের খবর। বড় খবর হলো। মমতার সফরসঙ্গী ব্যবসায়ী শিবাজী পাঁজার কলকাতা ফিরে গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনা। গ্রেপ্তারের যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা একজন মুখ্যমন্ত্রীর জন্যে অস্বস্তিকর হওয়ারই কথা।

কার্যত, মমতা নিজেই বাংলাদেশের মানুষের নরেন্দ্র মোদীর দিকে তাকানোর ক্ষেত্র আরও ভালোভাবে প্রস্তুত করে গেলেন। তৃণমূল নেত্রী হয়তো বুঝতে পারেননি। কিন্তু এটাই সত্যি।

মোহন ভাগবতের ‘নিঃস্বার্থ সেবা’র কথা ছেড়ে টেরেসার নামে হৈচৈ শুরু করেছে মিডিয়া

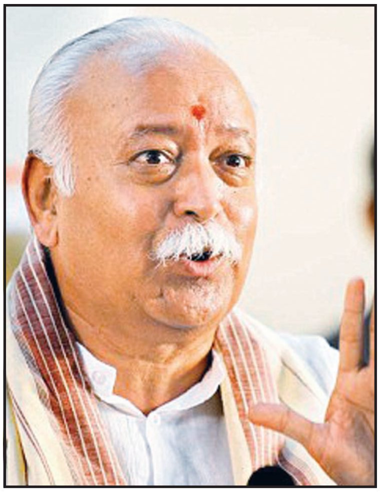

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত গত ২৪ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের ভরতপুরে ‘পরম সেবা গৃহ’ ও ‘শিশু বাল গৃহ’-র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত নাগরিকদের সমানে সেবা কাজে ভারতীয় ভাবনার ব্যাখ্যা করেন। সংবাদমাধ্যমের একাংশ তাঁর ভাষণের কিছু অংশকেই তুলে ধরে সমালোচনা শুরু করেছে। শ্রী ভাগবত বলেন, এখানে এসে যে কেউ দেখলে তিনি সেবাভাবী হয়ে পড়বেন। তাঁর সামনে সেবার একটা সুন্দর ছবি ফুটে উঠবে। তিনি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করার জন্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সোনালি নেউলের উদাহরণ রাখেন। বলেন, এখন ‘সেবা করা’-কে আমরা খুব বড় কথা মনে করি। মনে করা উচিত ও অনুকরণ করাও উচিত। যাঁরা নিঃস্বার্থ সেবা করছেন তাঁদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে মানুষ কাজের দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হয়ে যান। আর তা নিঃস্বার্থ সেবা কাজ। দুঃখীর প্রতি করুণা হওয়া মানুষের স্বাভাবিক গুণ। সেবার পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়। মাদার টেরেসার সেবাও খুব ভাল হোত যদি তাঁর সেবার পিছনে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার কাজগুলি না থাকতো। সেবার আড়ালে ধর্মান্তরণের উদ্দেশ্য থাকার তাঁর সেবা ভাবনা দূষিত হয়ে গিয়েছে।

শ্রী ভাগবত বলেন, ভারতে বিশুদ্ধ রূপে গরিব ও অসহায় লোকেদের সেবা করা হয়। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ও কোনো কিছু চাওয়ার বদলে এখানে সেবা করা হয় না। যখন এরকম মনোভাবে আমরা সমাজের সেবা করবো তখন সমাজ দৃঢ় হবে।

গণতন্ত্রের জন্য হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন : সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অস্তিত্ব ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। গত ১ মার্চ দিল্লীর জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিরাট হিন্দু সম্মেলনে লক্ষাধিক মানুষের সামনে কথাগুলি বলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী।

তিনি বলেন, যেহেতু দেশের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা হিন্দুদের ওপর নির্ভর করছে তাই হিন্দুদের ৮০ শতাংশ থাকতেই হবে। কাশ্মীরঘাঁটি বা কেরলের মল্লাপুরমে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নেই তাই সেখানে কোনো গণতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষতা নেই। হিন্দুরা সেখানে খুবই বিপদের মধ্যে আছে।

তিনি বিশেষভাবে তিনটি বিতর্কিত মন্দির-মসজিদের উল্লেখ করে বলেন, খুব শীঘ্র এ ব্যাপারে মোদী সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। অযোধ্যায় রামজন্মভূমি, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান মন্দিরের তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কে বলছে মসজিদ ভাঙা যায় না? রাস্তা ও স্কুলের জন্য সৌদি আরবে অনেক মসজিদ ভাঙার প্রমাণ আছে। আমাদের সরকারের আইনের মাধ্যমে তা করা উচিত।

বিরাট হিন্দু সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী।

অনুষ্ঠানে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়া বলেন, কয়েকটি ঘরবাপসি অনুষ্ঠানের জন্য বিরোধী দলগুলি চিৎকার করছে। কিন্তু তারা সংসদে ধর্মান্তরবিরোধী আইন পাশ করার জন্য উৎসাহ দেখাচ্ছে না। আসলে এরা হিন্দুদের শত্রু। ধর্মান্তরিত হিন্দুরা নিজের ধর্মে পুনরায় ফিরে আসতেই এদের গাত্রদাহ। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরলে হিন্দুরা শীঘ্রই সংখ্যালঘু হয়ে যাবে।

এই প্রথম ভোটে জেতার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব করা হয়নি

এই প্রথম দেখলাম ভোটে জেতার জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব করা হয়নি। মোদী সরকার বুঝিয়ে দিয়েছেন দলের স্বার্থ থেকে দেশের স্বার্থ বড়। চলতি বছরে বিহারে এবং আগামী বছর এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু ও অসমের বিধানসভার ভোট। তাই অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে আয় করে বিপুল ছাড়-সহ নানারকম ভরতুকি দিয়ে জনমোহিনী কেন্দ্রীয় বাজেট প্রস্তাব সংসদে রাখা হবে। তা হয়নি। বাজেটের মাধ্যমে মোদী সরকার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই সরকারের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সংস্কার এবং সংস্কারের হাত ধরে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। গত ছয় দশক ধরে দেশে চটজলদি সমস্যার সমাধানের পথ বাতলেছে কেন্দ্রীয় বাজেট। অথচ সকলেই জানেন আর্থিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগে। রাতারাতি কোনো গরিব দেশ ধনী হয় না। কেন্দ্রের মোদী সরকার যে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের পথে হাঁটতে চাইছে তার সঙ্কেত ছিল রেল বাজেটে। কোনো নতুন ট্রেন বা বড় চটকদারি প্রকল্প নয়। বলা হয়েছে, অতীতে ঘোষিত রেল প্রকল্পগুলির কাজ শেষ না করে নয়া প্রকল্পের ঘোষণা হবে না। নতুন ট্রেনের পরিবর্তে চালু ট্রেনগুলির যাত্রীদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাই রেল মন্ত্রকের এবার লক্ষ্য ও কর্তব্য। একটু ভেবে দেখুন তো, ট্রেনে যাত্রা কী সুখকর। 'দুরন্ত', 'শতাব্দী' এবং 'রাজধানী' এক্সপ্রেস ছাড়া অন্য ট্রেনে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য ও যাত্রী নিরাপত্তা আছে কি? যাত্রীরা সুপারফাস্ট ট্রেনে যাত্রার অতিরিক্ত ভাড়া দিচ্ছেন। অথচ ট্রেন চলছে ঢিমেতালে। তাই নতুন ট্রেনের চমক নয়, চালু ট্রেনের উন্নয়নই পাখির চোখ মোদী সরকারের। দেশের প্রথাগত ভোট রাজনীতিতে এমনটা হয় না। মমতা রেলমন্ত্রী থাকাকালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি রেল প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। যার একটাও রূপায়িত হয়নি। মমতা হাততালির রাজনীতি করেন। সেই সস্তার রাজনীতিতে কিছু মানুষকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত বা মোহিত করা যায়। পরে চালাকিটা ধরা পড়লে তীব্র ঘৃণার মাশুল গুনতে হয়। যেমন, তৃণমূল কংগ্রেসকে এখন গুনতে হচ্ছে।

গূঢ় পুরুষের
কলম

আমার চোখে কেন্দ্রীয় বাজেটে এবার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ কালো টাকা আটকাতে কড়া আইনের ঘোষণা। সরকারের পক্ষে বলা হয়েছে যে ভবিষ্যতে কালো টাকা বিদেশের ব্যাঙ্কে যাতে না যায় তার জন্য দু'টি নতুন বিল সংসদের চলতি বাজেট অধিবেশনে আনা হবে। এ' ছাড়াও দেশের 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৯৯' (ফেমা) এবং প্রিভেনসন অফ মানিলন্ডারিং অ্যাক্ট, ২০০২ সংশোধন করে কালো টাকার কারবারিদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। ভারতে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, লগ্নি সংস্থা আছে যারা কালো টাকা গোপনে বিদেশে পাচার করে। এই দু'টি আইনের সংশোধন করে এদের কঠোর সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করাই মোদী সরকারের লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, দেশের প্রোমোটারি ব্যবসা বা আবাসন শিল্পে সবচেয়ে বেশি কালোটাকার রমরমা চলে। আপনার নিজের এলাকার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন না। চিনতে পারবেন না। চোদ্দতলা, আঠারো তলার বিশাল বিশাল প্রাসাদ মাথা তুলেছে। পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনের সিংহভাগ দখল করেছে নতুন-নতুন আবাসন প্রকল্প। এক বা দুই কোটি টাকার ফ্ল্যাট অনায়াসে বিক্রি হচ্ছে। এ' সবই কালোটাকার রূপকথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেনামী লেনদেন চলে। মোদী সরকারের লক্ষ্য, ফ্ল্যাট কিনতে গেলে প্যান নম্বর জানাতে হবে। যাতে আয়কর দপ্তর নজরদারি চালাতে পারে। যে কোনো মূল্যে বিদেশে কালো টাকা পাচারচক্রকে রুখতে হবে। মনে রাখতে হবে আইন বানালেই অপরাধ বন্ধ হয় না। আইনের কঠোর প্রয়োগ ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সবিনয়ে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিশ্রুতি মতো ১০০ দিনের মধ্যেই বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অবৈধ কালো টাকা দেশে ফেরানো যায়নি। বিদেশ থেকে কালো টাকা ফেরানো কঠিন কাজ। এবং সময়সাপেক্ষ। মোদী সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম বি শাহের নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। ওই পর্যন্ত যতটুকু জানা গেছে তাতে ১,১৯৫ জন ভারতীয় নাগরিক বিদেশের ব্যাঙ্কে ২৫,৪২০ কোটি টাকা গোপনে গচ্ছিত রেখেছে। বিদেশের ব্যাঙ্কগুলি ভারতের আইন মেনে চলে না। তবে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক জানিয়েছে নির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তারা ভারত সরকারের তদন্তে সহযোগিতা করবে। সংসদে বাজেট প্রস্তাব রাখতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন, 'কালো টাকা চিহ্নিত করে তা ফিরিয়ে আনতে আমরা দেশবাসীর কাছে দায়বদ্ধ। কিন্তু বর্তমান আইনের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তাই কালো টাকা রুখতে নতুন বিল আনা হচ্ছে।' অর্থমন্ত্রী বলেছেন, বিদেশে রাখা সম্পত্তির কর ফাঁকি দিলে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং গোপন সম্পত্তির তিন গুণ টাকা জরিমানা বাবদ দিতে হবে। বাৎসরিক আয়কর রিটার্নে বিদেশে রাখা সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ হিসাব দাখিল করতে হবে। অসম্পূর্ণ হিসাব দিলে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। বিদেশি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকলে আয়কর রিটার্নে তার উল্লেখ করতেই হবে।

আয়কর আইন এবং সম্পত্তি কর ফাঁকি রোধের কড়া আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে কালো টাকার কারবারিদের শায়েস্তা করা সম্ভব।

আজকে যে রাজা উজির, কাল সে মুকুল রায়

মাননীয় মুকুল রায়
প্রাক্তন...
প্রাক্তন...
প্রাক্তন...
নিজাম প্যালেস, কলকাতা

মুকুলদা, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়। আপনার সব উপাধির সামনেই এখন প্রাক্তন শব্দটি বসে গেছে। কোনটা যে লিখি তাই সবই বাদ রাখলাম। শূন্যস্থান পূরণ করে নেবেন। আপনি এখন একজন রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মতো সাধারণ সাংসদ। যে ক্ষমতায় আপনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন আজ সেই সরাটুকুও আপনার নেই। সত্যিই এটা অন্যায়। তবু মেনে নিতে হবে। ওই যে গান আছে না, চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়, কাল যে রাজা উজির, আজ সে ভিক্ষা চায়... কিংবা joy and woe are woven fine কিংবা চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।

দিদিকে আপনি চিনতে ভুল করেছিলেন। দিদি যেমন ভালোবেসে কাছে টানতে জানেন তেমন দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে জানেন। ক'দিন আগেই একটি বহুল প্রচারিত বাংলা সাময়িকী আপনাকে বঙ্গেশ্বর আখ্যা দিয়ে কভার স্টোরি করেছিল। তাতে আপনার সঙ্গে তুলনায় আনা হয়েছিল প্রমোদ দাশগুপ্ত থেকে অনিল বিশ্বাসদের। বলা হয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের যে সাংগঠনিক শক্তি তা আপনার হাতেই তৈরি। আপনিই আসল কারিগর। গোটা রাজ্যকে আপনি হাতের তালুর মতো চেনেন। আপনার অনুগত সৈনিকের অভাব নেই। কিন্তু আপনি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন তারা আপনার অনুগত ছিল। কেন আপনাকে দেখলে স্যালুট করত! আসলে ক্ষমতা। ক্ষমতাকেই লোকে স্যালুট করেছে আপনাকে নয়।

এ ব্যাপারে আমার একটা বিশ্লেষণ আছে। মতবাদ যাই হোক এই রাজ্যে শূন্য থেকে বিপুল ক্ষমতায় পৌঁছনোর সব থেকে বড় নজির অবশ্যই সিপিএমের। আর তার কারিগর ছিলেন দুই রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত ও অনিল বিশ্বাস। কিন্তু সেই দু'জনকে আবার এক সারিতে বসালে চলবে না। প্রমোদ দাশগুপ্ত যখন পার্টির সংগঠন করেছেন তখন তাঁর হাতে পুলিশ ছিল না। বরং পুলিশের মারাত্মক বাধা ও অত্যাচার ছিল। তারই মধ্যে গোপনে গোপনে কমিউনিস্ট ভাবনা ছড়াতে হয়েছিল তাঁকে। সংগঠন গড়ে তুলতে হয়েছে। সে কাজ সত্যিই অকল্পনীয়। কিন্তু অনিল বিশ্বাসকে বড় সংগঠকের শিরোপা দেওয়া হলেও তাঁকে অত বেগ পেতে হয়নি। তাঁর আমলে দল ক্ষমতায়। বিপুল ক্ষমতায়। শরিকদের দয়া করে বামফ্রন্টে রেখেছিল সিপিএম। হাতে পুলিশ-প্রশাসন। তাদের ব্যবহার করে বিরোধীদের কোণঠাসা করা আর সংগঠন বাড়ানোটা তাই সহজ হয়েছিল।

মুকুলদা, আপনি নিয়েছিলেন অনিল বিশ্বাসের পথ। পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তার যোগ্য ব্যবহার করে বিরোধীদের পঙ্গু করে দিয়েছেন। জেলায় জেলায় বিরোধী-শিবিরের লোকেদের ভয় দেখিয়ে তৃণমূল করতে বাধ্য করেছেন। একের পর এক পঞ্চায়েত, পুরসভা দখলের ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যাবে ভক্তি নয়, ভয়ই তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করেছে। রাজ্যসভায় নিজেদের প্রার্থীদের জেতানোর জন্য টাকা আর ক্ষমতার লোভ দেখানোর পাশাপাশি বিধায়ক কেনা-বেচার অভিযোগও উঠেছে। কিন্তু তাতে আপনার কিছু যায় আসেনি। সব অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পেরেছেন। কারণ, বিপুল জন সমর্থনের সঙ্গে আপনারা ক্ষমতায়।

কংগ্রেস ভেঙে একটা তৈরি সংগঠন নিয়েই নতুন দল গড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর সেটা দিন দিন বড় হয়েছে কংগ্রেস ছোট হওয়ার কারণে। এরপর বাম-বিরোধী হাওয়া ক্ষমতায় এনে দিয়েছে। হাওয়া তৈরি ছাড়া কিছুই তেমন করতে হয়নি। আর ক্ষমতায় আসার পর আপনি সেই সংগঠনকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে নিয়ে গেছেন। এটা সব থেকে ভালো জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তিনি আপনাকে সরিয়ে দিতে সময় নষ্ট করেননি। তিনি জানেন, পুলিশ- প্রশাসনকে কাজে লাগানোর ট্রেনিংটা দিয়ে দিলে যে কোনো নেতাই আপনার কাজটা করতে পারবে।

তবে, একটা তবে আছে। দলীয় কোন্দল মেটাতে আপনি যে মধ্যস্থতা করতেন সেটা সকলেই পারবে এমন কোনো কথা নেই। যেটা মেটানো যাবে না সেটা চাপা দিয়ে রাখার কাজটাও আপনি ঠিক অনিল বিশ্বাসের মতো পারতেন। এখন সেই কাজটা কে করবে? এটার জন্য বিশেষ দক্ষতা লাগে। সবাই পারে না। মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন, সিউড়ির বিধায়ক স্বপনকান্তিদের ক্ষোভ অনেকদিনের। কিন্তু যেই না আপনাকে নিয়ে লুকোচুরি খেলা শুরু হয়েছে অমনি তা প্রকাশ্যে এসে গেছে। ফলে দিন যত যাবে মুকুলহীন তৃণমূলে এসব আরও বাড়বে। মুকুলদা, আপনি দূর থেকে উপভোগ করুন।

—সুন্দর মৌলিক

শ্রীমোহন ভাগবত নির্জলা সত্য বলে মৌচাকে ঢিল মেরেছেন

অমলেশ মিশ্র

১৯৯২-র ১৪ জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার ক্রিপ্স্ ক্লিনিকে শ্রীমতী টেরেসার হৃদযন্ত্রে শল্য চিকিৎসার পরে সমবেত ডাক্তার ও সেবিকাদের বলেন :

'কিছু কিছু জিনিস বেশ সুন্দর...সন্ত পিটারের জন্য বিশেষ টিকিট না নিয়ে কেউ মরেনি। আমরা বলি সন্ত পিটারের জন্য ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ টিকিট। আমরা মৃতপ্রায়দের শুধাই, তুমি কি এমন আশীর্বাদ চাও যার দ্বারা তোমার পাপ ক্ষমা করা হবে এবং তুমি ঈশ্বরকে পাবে? তারা, কোনওদিন 'না' বলেনি। এই ভাবে ১৯৫২ সাল থেকে ২৯ হাজার মানুষ কালীঘাটের ভবনে মারা গেছে। (Mother Teresa : The Final Verdict —অপরূপ চ্যাটার্জী। অনুবাদ : মাদার টেরেসা মুখ ও মুখোশ। অমৃতশরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, কলকাতা ১২৬, পৃ. ৮৯)

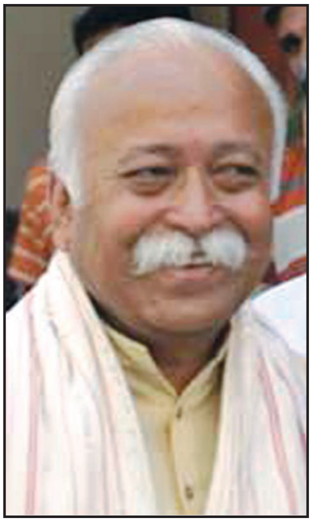

এখানে বলা দরকার যে কালীঘাটের নির্মল হৃদয় আসলে একটি মৃতপ্রায় নিঃস্বদের ভবন। সেখানকার ব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, পরিচালনা ও দৃষ্টিভঙ্গি রোমহর্ষক— যা এই শতাব্দীতে চিন্তা করা যায় না। তাই বলা চলে যে, শ্রীমতী টেরেসা দারিদ্র্য ভালবাসেন, দরিদ্রকে নয়। (ওই অনুবাদ পুস্তকের সপ্তম অধ্যায়টি পড়ুন)।

মিশনারিজ অফ চ্যারিটির পূর্বতন সন্ন্যাসিনী সুসান শিল্ড লিখেছেন :

'মৃত্যুপথযাত্রীদের ভবনে মাদার গোপনে শেখান কীভাবে মৃত্যুপথযাত্রীদের খৃষ্টায়িত করতে হবে। মৃতপ্রায় মানুষকে শুধাতে হবে সে 'স্বর্গের টিকিট' চায় কি-না। সম্মতি সূচক উত্তর পেলে সিস্টার একটা ভিজে তোয়ালে নিয়ে রোগীর কপাল মুছতে থাকবেন এবং বিড় বিড় করে সব মন্ত্র আওড়াতে থাকেন। গোপনীয়তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, মাদার টেরেসার সংস্থা গোপনে হিন্দু ও মুসলমানদের খৃষ্টায়িত করছে। এটা জানাজানি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।'

(Christopher Hitchens : Missionary Position, 1995, p. 48. উল্লিখিত অনুবাদ পুস্তক পৃ. ৮৮)

শ্রীমতী টেরেসার সংস্থার সবকিছুই ছিল খৃষ্টান হওয়ার শর্তে— সে ফুড কার্ড হোক বা আবাসন বণ্টন হোক। আসলে মিশনারি মাত্রেই প্রলোভন দিয়ে ধর্মান্তরকরণ করে আসছেন আজ ২০০ বছর ধরে। শিক্ষিত মানুষরা না হয় বাইবেল পড়ে বা শুনে উৎফুল্ল হয়ে খৃষ্টধর্ম নিয়েছেন ধরা গেল, কিন্তু লক্ষ লক্ষ বনবাসী কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতালরা তো অক্ষরজ্ঞানহীন— তারা কেন খৃষ্টান হলো? তাদের খৃষ্টান করল কে? সুনীতা কুমার বা নবীন চাওলাদের কাছে এর উত্তর নেই। উত্তরটা তাঁরা অবশ্যই জানেন, কিন্তু প্রকাশ্যে বলতে পারবেন না।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ রাজস্থানের একটি অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক প্রধান শ্রীমোহন ভাগবত বলেছিলেন, মাদার টেরিজার দরিদ্র সেবার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ধর্মান্তরকরণ। শ্রীভাগবতের নির্জলা সত্য বাক্যটি অনেকের বিরাগ ও ক্রোধের সঞ্চার করেছে। তাঁর বক্তব্য সংশোধন করার কথা আমার বলা উচিত নয়। তবু আমি যেটুকু জেনেছি, তা হলো— টেরেসা দরিদ্রসেবাও করেননি। তিনি দারিদ্র্য পছন্দ করতেন ঠিকই, তবে দরিদ্রকে নয়। নির্মল হৃদয় আশ্রম-সহ টেরেসার কাজকর্মে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের বিভিন্নভাবে লেখা বক্তব্য থেকেই এটা জানা যায়।

যাই হোক, যাঁরা আপত্তি করেছেন তাঁদের মধ্যে সুনীতা কুমারের নাম পড়া গেল আনন্দবাজার পত্রিকায়। প্রসঙ্গ বলতে হয় যে এদেশে টেরেসার একান্ত অনুগতদের মধ্যে ছিলেন নবীন চাওলা (দুর্নামযুক্ত একজন আমলা), কুমার পরিবার— যাঁর মধ্যে শ্রীমতী সুনীতা একজন, তিনি ছিলেন টেরেসার মুখপাত্র। অতিশয় ধনী পরিবার। ঊষা উত্থুপ, বিখ্যাত গায়িকা। তিনি এইড্‌স্ ও ড্রাগ বিরোধী সংস্থা 'স্পাদ্রা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। টেরেসা শ্রীমতী উত্থুপকে বলেছিলেন যে ওইসব দানসত্রের জন্য টাকা খরচ না করে তাকেই টাকা দিতে। শ্রীমতী উত্থুপ নিজের গলার হারটা সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেন। অথচ টেরেসার শেষকৃত্যের সময় উত্থুপ যখন রামধুন গাইতে চাইলেন, তাঁকে গাইতে দেওয়া হলো না 'যেহেতু ওই রঘুপতি রাঘব' গানটি ক্যাথলিক গীতি নয়— সর্বধর্ম-গীতি।

টেরেসা ছিলেন একজন মিশনারি। আর মিশনারিদের কাজই হলো খৃষ্টধর্ম প্রচার। প্রবর্তিত ধর্ম মাত্রেই অন্য ধর্মের লোককে নিজ ধর্মে ধর্মান্তরিত করে, এ কোনো নতুন কথা নয়। এর জন্য কোনো গবেষণার প্রয়োজন হয় না। রাজার সাহায্য নিয়ে ধর্ম প্রচার, বল প্রয়োগে ধর্মান্তরকরণের উদাহরণের অভাব ইতিহাসে নেই।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্ট ভারতে

মিশনারি রপ্তানির পক্ষে জনৈক উইলবার ফোর্স ওকালতি করলেন। বললেন, আমাদের খৃষ্টধর্ম স্বর্গীয়, বিশুদ্ধ এবং উপকারী। ভারতীয় ধর্মসমূহ ইতর, লাম্পট্যময় এবং নিষ্ঠুর— অত্যন্ত ঘৃণাজনক। উইলবার ফোর্সের তত্ত্ব সংখ্যাধিক্যে পাশ হয়ে গেল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত সনদে দেশীয়দের পারত্রিক ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য বছরে পাঁচ হাজার পাউন্ড বেতনে সারা ভারতের জন্য একজন বিশপের ব্যবস্থা হলো। যদিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক পরিচালক বলেছিলেন, একদল মিশনারির থেকে বরং একদল শয়তানকে বিশ্বাস করব।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় লিখলেন, 'কতক ব্যক্তি মিশনারি নামে হিন্দু-মোছলমানকে তাহাদের ধর্ম হইবে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার যাবতীয় যত্ন করিতেছে। প্রথম প্রকার হইল— নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক যাহা হিন্দু-মোছলমান ধর্মের নিন্দা, হিন্দু দেবতা ও ঋষিদের জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পূর্ণ। দ্বিতীয় প্রকার হইল, লোকের দ্বারের নিকট বা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপন ধর্মের উৎকর্ষ ও অন্য ধর্মের অপকর্ষ কীর্তন এবং তৃতীয় প্রকার হইল— কোনো কারণে খৃষ্টান হইলে কর্ম ও প্রতিপালন।'

১৮১৩ থেকে ১৮২১ পর্যন্ত মাত্র ৮ বছর তাতেই ব্রাহ্মবাদী রাজা রামমোহনের এই অভিজ্ঞতা। সুনীতা কুমার ২০১৫-তে অর্থাৎ ২০০ বছর পরে একজন মিশনারির হয়ে ওকালতি করছেন। ৮ বছরে যদি ওইরকম হয়ে থাকে তাহলে ২০০ বছরে ওই কীর্তি কতগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে, তা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না।

মিশনারিতে আসা মানেই খৃষ্ট প্রচারের জন্য আসা— এই সাধারণ জ্ঞান সকলেরই থাকা উচিত। মিশনটা যদি খৃষ্টধর্ম প্রচার হয়— মিশনারি তাহলে ওই কাজ ছাড়া অন্য কী করবেন?

জেনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক মিশনারিকে কতকগুলি মূল বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতেই হয়। যেমন—

১. নিউ টেস্টামেন্ট ঈশ্বরের মুখপাত্র যীশুর মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য। (যদিও বাইবেলে যীশুর বাণী অতি সামান্যই— ৪৫ ভাগ যীশুর, চার শিষ্যের সুসমাচার এবং বাকিটা প্রেরিত শিষ্যদের কার্যাবলী)।

২. আদিম পাপ— মানব জাতির উদ্ভব এই পাপ থেকেই।

৩. মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারের জন্যই যীশুর আবির্ভাব। তাই যীশুর শরণ নিতে হবে।

৪. ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তৃতীয় দিনে যীশু কবর থেকে উত্থিত হলেন।

৫. যীশু স্বর্গারোহণ করে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হলেন।

৬. যেসব মানুষ যীশুকে একমাত্র পরিত্রাতা মনে করে এবং যীশুর মৃত্যু, পুনরুত্থান ও জন্মে বিশ্বাস করে, স্বর্গারোহণে বিশ্বাস করে, তারাই পরিত্রাণ পাবে। (অখৃষ্টানদের পরিত্রাণ নেই।)

৭. চার্চ হলো যীশুকে যারা একমাত্র পরিত্রাতা মনে করে তাদের সংগঠন। কাজ হলো--- ভজনা, প্রার্থনা, শিক্ষাদান, দীক্ষাদান, অখৃষ্টানদের ধর্মান্তরণ করে খৃষ্টান করা।

৮. মিশনে কাজ করলে মিশনারি। মিশনটা হলো--- অখৃষ্টানদের খৃষ্টধর্মে আনা। (ধর্মান্তরকরণ ব্যতীত এই কাজটি হওয়া সম্ভব নয়)।

৯. শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস স্থাপন।

টেরেসার কর্মযজ্ঞে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের অনেকেই পরে তা ত্যাগ করেছেন। তাঁদের লেখা থেকে জানা যায় যে, টেরেসা দারিদ্র্য খুব পছন্দ করতেন, কিন্তু দরিদ্রদের সম্পর্কে সামান্য সহানুভূতি ছিল কি না সন্দেহ। নির্মল আশ্রমে থাকা, খাওয়া, ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সম্পর্কে রোমহর্ষক বিবরণ তাঁদের লেখা থেকে পাওয়া যায়।

ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে টেরেসার স্বীকারোক্তি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। সন্ন্যাসিনী সুশান শিল্ডের কথাও বলা হয়েছে :

'শ্রীমতী টেরসা আমাদের দেশের অপমান করেছেন, কলকাতা শহরকে আস্তাকুঁড় আখ্যা দিয়েছেন যেখানে শুধু কুষ্ঠরোগীর ভিড়, প্রচুরতর অর্থ সংগ্রহ করেছেন, অথচ কিছুই দেননি।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৬ আগস্ট গ্রীস দেশের ম্যাসিডেলিয়ার স্কেপিও শহরে আলবেনী পরিবারে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছিল তার নাম দেওয়া হয় অ্যাগনেসগল্জে কোয়াহাজু। এই শিশুই পরবর্তীকালে মিশনারি অফ্ চ্যারিটিজের টেরেসা, শূন্যগর্ভ প্রচার সাফল্যে নোবেলজয়ী মাদার টেরেসা।'

১৯৫০ সালে পোপের সম্মতি নিয়ে মিশনারিজ অফ্ চ্যারিটি প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত টেরেসার নাম কলকাতা বা ভারতে অপরিচিত ছিল। এই রাজ্যে প্রায় অর্ধশতাব্দী কাটালেও তিনি কখনও বাংলা ভাষা শেখার কথা কল্পনায় আনেননি।

টেরেসার মৃত্যুর পর ক্যাথলিক টাইমস্ পত্রিকা লেখে, ম্যাগারিজ প্রচার না করলে টেরেসা হয়ত সাধারণের কাছে অজানাই থেকে যেতেন। ম্যাগারিজ ছিলেন একজন সাংবাদিক, চিত্র পরিচালক ও লেখক। সাংবাদিকতা করতেন পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশনে। ইংলন্ড ও আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের ছিল অবাধ গতি। ১৯৬৮ সালে টেরেসা ও ম্যাগারিজের যোগাযোগ হয়। বহু মিথ্যা গল্প ফেঁদে ম্যাগরিজ পরিচিত করান টেরেসাকে। (পুরোটা জানতে হলে পড়ুন—

Mother teresa The Final Verdict, Meteor Books, Calcutta and London 2003। বাংলায় মাদার টেরেজা মুখ ও মুখোশ--- ডাঃ অরূপ চট্টোপাধ্যায়, অমৃতশরণ প্রকাশন, বিদ্যাসাগর রোড, কলি-১২৬)।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

রাজনৈতিক চাপেই কলেজ ক্যাম্পাসে নোংরা রাজনীতি

সাক্ষাৎকারে এবিভিপি-র রাজ্য সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মন

গত কয়েক বছরের হিসেবকে পিছনে ফেলে রাজ্যের ছাত্র রাজনীতিতে এগিয়ে আসছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। অনেক কলেজেই তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি। পাশাপাশি বিদ্যার্থী পরিষদকে আটকাতে তৈরি হয়েছে বিরোধীদের নতুন সমীকরণ। এই পটভূমিতেই এবিভিপি-র পশ্চিমবঙ্গ শাখার সংগঠন সম্পাদক কিশোর বর্মনের সঙ্গে কথা বলেছেন স্বস্তিকার প্রতিনিধি শুভাশিস রায়।

□ **এতদিনের পরিশ্রমের ফল পেলেন ছাত্র সংসদ জয়ের মাধ্যমে। কি বলবেন এ বিষয়ে?**

□ প্রথমত, এই জয় শুধুমাত্র এবিভিপি-র কার্যকর্তাদের জয় তো বটেই, পাশাপাশি এই জয় বাংলার সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরও জয়। কারণ তাঁরা তৃণমূলের এই অত্যাচার থেকে একটা বিকল্প ছাত্র সংগঠনকে খুঁজছিলেন, যে বিকল্প তারা এবিভিপি-র মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। এবিভিপি ১৯৪৯ সালে শুরু হলেও ১৯৫১ সাল থেকে বাংলায় কাজ শুরু করেছে। তারপর থেকে কাজ করে চলেছি, হঠাৎ করে আমাদের এই জয় আসেনি। এই জয় আমাদের অনেক পরিশ্রম করে লাভ হয়েছে।

□ **কেন্দ্রে এনডিএ সরকার আসার পরই এবিভিপি-র পালে হাওয়া। এখানেও তাহলে মোদীঝড় কাজ করল?**

□ না, পুরোপুরি মোদীঝড়ে এভিবিপি-র পালে হাওয়া এসেছে আমরা বিশ্বাস করি না। মোদীঝড় না হলেও এই হাওয়া আসত, কেননা ২০১৩-র পরিকল্পনা মতো প্রতিটি কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখ থেকে তাদের সমস্যা এবং অসুবিধার কথা আমরা শুনেছি। এরপর আমরা ‘সেভ ক্যাম্পাস’ ও ‘সেভ এডুকেশন’ কর্মসূচির পরিকল্পনা করি। ২০১৩-’১৪-’১৫— এই তিন বছর কলেজে কলেজে প্রচার চালাই। ২০১৩-তে আন্দোলনে সফল হই। প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তবে কিছুটা হাওয়া তো আছেই, অস্বীকার করা যাবে না। হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা ২০১৩-তে করেছি আমরা।

□ **কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনায় জড়িত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত?**

□ আমরা যেটা লক্ষ্য করছি ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে বহিরাগতদের সংখ্যাই বেশি যারা অধ্যাপকদের হেনস্থা করছে। কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্য করে রাজনীতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমরা তীব্রভাবে এর নিন্দা করছি। কিন্তু এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ী করা মোটেই ঠিক নয়। সম্পূর্ণ বহিরাগত এবং রাজনৈতিক নেতাদের ইন্ধনেই এগুলি হচ্ছে। এ থেকে মুক্তির উপায় বিদ্যার্থী পরিষদ।

□ **সমস্ত কলেজে অনলাইন ভর্তি পরিষেবা কেন চালু হচ্ছে না বলে মনে করছেন?**

□ অনলাইনের দাবি বিদ্যার্থী পরিষদের বহুদিনের। শুধু অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়া নয়, পাশাপাশি অনলাইনে নমিনেশন ফর্ম ওঠানো এবং

জমা দেওয়া দু'টোই বিদ্যার্থী পরিষদের চাহিদা। তবে অনলাইনে ফর্ম ডাউনলোড করা যায়, ফিলআপ করে জমা দেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কলেজেই অনলাইনে ফিলআপ করে জমা দেওয়া শুরু হয়নি। এখানে মিথ্যা বলা হচ্ছে যে অনলাইনে ভর্তি চালু হয়ে গেছে। এর পিছনে কারণ একটাই— তোলাবাজি বন্ধ হয়ে যাবে অনলাইন চালু হলে।

■ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আন্দোলন তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা সফল বলে মনে করে বিদ্যার্থী পরিষদ?

■ এতে তাদের সফলতা বলা যাবে না। যাদবপুরের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ ছিল। তা চালু করতেই সরকার অনৈতিকভাবে কাজটা করে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন না কে উপাচার্য থাকবেন আর কে থাকবেন না। উপাচার্য থাকবেন কি থাকবেন না সেটা নির্ভর করে উপাচার্য ও রাজ্যপালের উপর। আমাদের রাজ্যের দুর্ভাগ্য যে, মুখ্যমন্ত্রীই আমাদের আইন ও আমাদের সংবিধান। সেই সুযোগে কিছু ছাত্র-ছাত্রী যাদবপুরের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কলুষিত করছে।

■ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পারলেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও পর্যন্ত দাগ কাটতে ব্যর্থ এবিভিপি। এই ব্যর্থতা কিসের জন্য?

■ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপি দাগ কাটতে পারছে না এমনটা নয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বহু সমর্থক আছে। আজ যারা 'হোক কলরব' করছে তারা রাষ্ট্রবিরোধী প্রফেসর গিলানিকে এনে কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ নয় বিষয়বস্তু নিয়ে সেমিনারের আয়োজন করে। সেখানে আমাদের সমর্থক ছাত্র-ছাত্রীরা সেই অনুষ্ঠান করতে দেয়নি। সেদিন আমাদের উপর লাঠি রড নিয়েও আক্রমণ করা হয়। আমাদের কার্যকর্তা নীরজ কুমারের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটা এতটাই জাতীয়তাবিরোধী যে কাজ করতে গেলেই আমাদের ওপর হামলা হচ্ছে।

■ ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি না মানলে অধ্যক্ষ বা উপাচার্যদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। তাদের পছন্দের না হলে সেই সম্মানজনক পদ থেকে কি সরে যেতে হবে বা মার খেতে হবে?

■ কলেজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করবেনই। আন্দোলন মোকাবিলা করার উপর তা নির্ভর করছে। কোন সংগঠন সেখানে আন্দোলন করছে সেটা একটা ব্যাপার। যদি দেখা যায় শাসক দলের সংগঠন আন্দোলন করছে এবং সেই দাবি-দাওয়া উপাচার্য, অধ্যক্ষরা মানছেন না, তাহলেই দেখা যাচ্ছে তাঁকে হেনস্থা হতে হচ্ছে অথবা সরে যেতে হচ্ছে। যাঁরা প্রকৃত শিক্ষক, সরকারকে তোষামোদ করেন না তাঁদের হেনস্থা হতে হচ্ছে।

■ সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রীর দাবি শিক্ষাক্ষেত্রে বাম আমলের তুলনায় বিশৃঙ্খলা কমেছে ৬০ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রী কতটা ঠিক বলেছেন?

■ শিক্ষামন্ত্রী যেটাকে বলেছেন ৬০ শতাংশ কমেছে সেটা বরং বেড়েছে ৬০ শতাংশ। ছাত্র নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিনি ছাত্র সংগঠনের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেছিলেন। বৈঠকে বলেছিলেন সকলকে নির্বাচনে লড়ার সুযোগ করে দিতে হবে, কোথাও কোনো সন্ত্রাস যেন না হয়, সবাইকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দিতে হবে। বাস্তবে উলটো হলো। তিনি যা বলেন তার উলটোটাই হয়। এখানে একথা বলার মানে ৬০ শতাংশ বেড়েছে। সিপিএমের ৩৪ বছর তৃণমূলের সাড়ে ৩ বছরেই ছাপিয়ে গেছে।

■ সংখ্যালঘু ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া হোল। এবার থেকে এস সি, এস টি-দেরও দেওয়া হবে। কীভাবে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে?

■ ভোটের আগে এটা একটা প্রলোভন। তিনি তো অনেক নাটক করে থাকেন। বিভিন্ন ঋণের প্রলোভন তিনি দেখাচ্ছেন। বাস্তবে তিনি কিছুই করেন না। মোদ্দা কথা, আমরা এস সি, এস টি বুঝি না। ওঁর মাথায় যদি সাইকেল দেওয়ার কথা যেখান থেকেই এসে থাকুক তা উত্তম প্রস্তাব। আমরা চাই সমস্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল দেওয়া হোক। ধর্ম-বর্ণ-জাতি না দেখে দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী।

■ এবিভিপি-ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মুসলমান কার্যকর্তার অভাব। বিরোধীদের দাবি বিদ্যার্থী পরিষদের থেকে তারা এই জায়গায় এগিয়ে। কি বলবেন?

■ আমরা হিন্দু-মুসলমান হিসেবে দেখি না। ছাত্রসমাজ হিসেবে দেখি। লালপুর কলেজে সদ্য আমরা জিতেছি। এই কলেজে আমাদের যে ১৫ জন প্রার্থী আছে তাদের মধ্যে ৭ জন মুসলমান। তারাও যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে ছাত্র সংসদের যে বোর্ড গঠিত হয়েছে তাতে বিভিন্ন পদে আছে এবং এখানকার যিনি সংগঠনের কাজ দেখাশোনা করেন তাঁর নাম আবদুল আলিম আনসারি। এছাড়া অন্যান্য কলেজেও এরকম অনেকে রয়েছে। এটাকে আমরা বড় করে দেখি না। তা সত্ত্বেও আমাদের সদস্য সংখ্যা বাড়ছে। মূলকথা, বিদ্যার্থী পরিষদ ধর্ম-জাতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। এটা বিরোধীদের ব্যাখ্যা।

■ বিরোধীদের দাবি মালদা-সহ অন্যান্য জেলাতে এবিভিপি যে ১২ ঘণ্টার বনধ্ ডেকেছিল মানুষ তাতে সাড়া দেয়নি। কি বলবেন?

■ রাজ্য জুড়ে এবিভিপি-র একটা ঝড় বইছে। সেই ঝড়ে ওদের জমি হারিয়ে যাচ্ছে। ওরা উটের জাত। ওরা এখন ঝড়ের মধ্যে পড়ে বালির মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়েছে। স্বতঃস্ফূর্ত বনধ সেখানে হয়েছে। ওরা দেখতে পায়নি। শুধু মালদা নয়, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ারে বনধ হয়েছে।

■ আগামী দিনে বিদ্যার্থী পরিষদের থেকে কি আশা করছে ছাত্র-ছাত্রীরা?

■ বাংলার বুকে একনম্বর স্থানে চলেই এসেছে বিদ্যার্থী পরিষদ। আগামীদিনে মূল লক্ষ্য সেটাকে প্রতিষ্ঠা করা। ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা মতো একটি অরাজনৈতিক শান্ত, স্বচ্ছ কলেজ ক্যাম্পাস তারা পাবে। শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ একমাত্র বিদ্যার্থী পরিষদই দিতে পারে। শিক্ষার পরিবেশযুক্ত কলেজ ক্যাম্পাস দিতে বদ্ধপরিকর বিদ্যার্থী পরিষদ।

এবিভিপি-কে আটকাতে নয়া সমীকরণ

শুভাশিস রায়

রাজ্যে পালা বদলের হাওয়া উঠেছে বেশ কয়েক বছর হলো। যে হাওয়ায় ভর করে টানা ৩৪ বছর রাজ্যকে শোষণ করে চলা বামপন্থীদের ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে আমজনতা। পরিবর্তে চেয়েছিল সুষ্ঠু রাজনীতির পরিবেশ। এর কিছুদিন পরেই আর এক পরিবর্তনের ঝড় ওঠে দেশ জুড়ে। পরিবারতন্ত্রের কায়েমি স্বার্থ এবং দুর্নীতির কালো ছায়া দূর করে স্বচ্ছ সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পায় গেরুয়া শিবির। এবার নয়া পরিবর্তনের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে বাংলার ছাত্রসমাজ। গতানুগতিক রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে শিক্ষার অঙ্গনে ফেরাতে চলেছে শিক্ষার পরিবেশ। যার ফলে নিশ্চিত হবে ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা। তুষ্টিকরণের জায়গায় প্রতিষ্ঠা পাবে নিরপেক্ষতা এবং প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক পথের সন্ধান।

গত সাড়ে তিন বছর ধরে মানুষ যা দেখছে তা গত চৌত্রিশ বছরের পুনরাবৃত্তি মাত্র। বাম আমলের দলতন্ত্রের স্বৈরাচারিতাকে উপড়ে ফেলে উন্নয়নের ডাক দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার প্রকৃত পরিবেশ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। শিক্ষাঙ্গনকে পরিণত করেছেন দলতন্ত্রের আখড়ায়। এছাড়া খারিজি মাদ্রাসাগুলিকে অনুমোদন দিয়ে জঙ্গি তৈরির প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এইসব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্রসমাজের কাছে ইতিবাচক আন্দোলনের

ডাক দিয়েছে ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। যাদের একটাই দাবি— ধ্বংস নয়, সৃষ্টি চাই, শিক্ষাঙ্গনে শান্তি চাই। কিন্তু এ রাজ্যের কোনো ছাত্রসংগঠনই সেকথা মানতে চায় না। তারা চায় শিক্ষাঙ্গনে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়ে ধর্মের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি। যদিও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছড়ানোর মনোভাবকে মেনে নেয় না আজকের ছাত্রসমাজ। তারা শুধুমাত্র চায় বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন। এই কারণেই ছাত্র সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠাংশ আজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব তুলে দিতে চায় বিদ্যার্থী পরিষদের হাতে। একের পর এক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিদ্যার্থী পরিষদ নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করে চলেছে। কিন্তু এবিভিপি-র এই চমকপ্রদ উত্থানে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে অন্য ছাত্রসংগঠনগুলি। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদকে আটকাতে হাতে হাত মিলিয়েছে তারা। তৃণমূলছাত্র পরিষদ, এস এফ আই, ছাত্র পরিষদ কিছুদিন আগে পর্যন্ত একে অপরের বিরোধিতা করলেও এখন তারা দায়ে পড়ে জোটবদ্ধ। এবিভিপি-কে রুখতে গঠিত হয়েছে এক নয়া সমীকরণ। কারণ আজ যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র-সংসদে স্থান পায় এবিভিপি, তাহলে রোজগারের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে তাদের, এমনটাই দাবি এবিভিপি-র। নির্বাচনে একক লড়লেও এবিভিপি-কে রুখতে ছাত্র সংসদ গঠনে একে অপরের সঙ্গে জোট বাঁধতেও পিছপা হয়নি তারা। জেনে রাখা দরকার, এবিভিপি কোনো রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন নয়। যেখানে এ রাজ্যে দাপিয়ে বেড়ানো অন্য ছাত্র সংগঠনগুলির প্রত্যেকটিই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুড়। তাই এবিভিপির কোনো দায় নেই কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জিতে কোনো রাজনৈতিক দলকে পুষ্ট করার।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলার আকাশে বাতাসে গুঞ্জন উঠেছিল রাজ্যের বিজেপি-কে আটকাতে তৃণমূল সিপিএমের হাত ধরতে চলেছে। আবার কখনও শোনা গেছে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেস জোটের সম্ভাবনা। এরই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল পুরুলিয়ার ঝালদায় অচ্ছুরাম মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্র সংসদ গঠনে। এই কলেজে মোট আসন ২২টি। এবিভিপি পেয়েছে ১০টি আসন, টিএমসিপি ৭টি, ছাত্র পরিষদ ৫টি এবং এস এফ আই ১টি। এবিভিপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও টিএমসিপি এবং সিপি জোটবদ্ধ হয়ে ছাত্র সংসদ গঠন করে। রাজনৈতিক মহলে স্লোগান ওঠে 'রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে কুস্তি আর ঝালদায় দোস্তি'। এরকমই কলকাতার খিদিরপুর কলেজে মোট আসন সংখ্যা ১৮। যেখানে এবিভিপি পেয়েছে ৭টি আসন। তাদের হাতে সংসদের ক্ষমতা যাতে না যায় তার জন্যে ময়দানে নামে সেই টিএমসিপি এবং সিপি, এখানেও তারা জোট বেঁধে ছাত্র সংসদ দখল করে। এবিভিপি সূত্রে খবর, রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের এলাকা এই খিদিরপুর। সুতরাং তাঁর নেতৃত্বে হওয়া এই কলেজ নির্বাচনে কলেজ যদি হাতছাড়া হয় তাহলে বঙ্গেশ্বরীর লালচক্ষুর সামনে পড়তে হবে তাঁকে। তাই যে কোনো উপায়ে ছাত্র সংসদ টিকিয়ে রাখতে তৎপর ছিলেন

নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। এবিভিপি-র অভিযোগের তালিকায় উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি- বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়। যার আসন সংখ্যা মোট ৫০। সেখানেও জোট। এস এফ আই ও সিপি ছাত্র সংসদ গঠন করে। সুতরাং একের পর এক জোটের দেখা মেলায় মূল রাজনীতিতেও জোটের ইঙ্গিত যেমন ধরা পড়ল তেমনি অন্য সমীকরণও বারবার ভেসে উঠল। এবিভিপি-র কার্যালয় সম্পাদক প্রণব দেবনাথের অভিযোগ, রঘুনাথপুর কলেজে কারচুপি করে জয়লাভ করে টিএমসিপি। ৪২টি আসনের মধ্যে এবিভিপি-র দখলে ২০টি এবং টিএমসিপি-র দখলেও ছিল ২০টি আসন। বাকি দু'টি আসনের ভোট গণনা না করেই ঘোষণা করে দেওয়া হয় আসন দু'টিতে জয়ী শাসকদলের ছাত্র সংগঠন। সুতরাং যেন তেন প্রকারেণ আটকাতে হবে এবিভিপি-কে। এই প্রথমবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ১৪টি আসনের মধ্যে সবকটিতেই জয়লাভ করে এবিভিপি। বালিগঞ্জ ক্যাম্পাসের জুট অ্যান্ড ফাইবার টেকনোলজি বিভাগে জয়লাভ করলেও এখনও পর্যন্ত বোর্ড গঠন করতে পারেনি (প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত) এবিভিপি। বিদ্যার্থী পরিষদের অভিযোগ, যেহেতু ছাত্র সংসদের দায়িত্ব চলে আসবে আমাদের হাতে, তাই এখনও পর্যন্ত কোনো উচ্চবাচ্য করতে দেখা যায়নি। এবিভিপি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আরও দু'টি কলেজে জিতে বোর্ড গঠন করতে পেরেছে। লালপুর মহাত্মা গান্ধী কলেজ। মোট আসন সংখ্যা ২১। এবিভিপি-র দখলে ১৫টি আসন। কোচবিহার মেখলিগঞ্জ কলেজে মোট আসন ২০টি। এবিভিপি ১২টি আসনে জয়লাভ করে ছাত্র সংসদ গঠন করে। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এবিভিপিকে সামনের সারিতে উঠে আসতে দেখে শঙ্কিত রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলি। তাই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে তারা। নির্বাচনে এককভাবে লড়লেও বোর্ড গঠনে একজোট হচ্ছে। কারণ আর কিছুই নয়, এবিভিপি-কে ক্ষমতায় বসতে দেওয়া যাবে না। তারা জানে, একবার ক্ষমতা হারালে আর ফিরে আসবে না।

শিক্ষার অঙ্গনে ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করে না এবিভিপি। সুতরাং, উন্নয়নের ধ্বজা ওড়াতে কলেজে কলেজে ইউনিট খুলে সংগঠন দৃঢ় করার যে প্রয়াস এবিভিপি শুরু করেছে তারই ফসল তারা ঘরে তুলছে এবার। হাজারো বাধা, নানান সমীকরণকে নস্যাৎ করে ক্রমশ উপরের দিকে উঠে আসতে শুরু করেছে এবিভিপি। আর পায়ের তলা থেকে জমি সরতে শুরু করছে শাসক দলের ছাত্র নেতাদের।

মেখলিগঞ্জ কলেজের ছাত্র সংসদ এবিভিপি-র

কোচবিহার জেলার এই কলেজে আগে ক্ষমতায় ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। এবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এবিভিপি জয়লাভ করে। বর্তমানে এই কলেজে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন স্বদেশ রায়। তাঁর সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো।

□ কতগুলি আসনের মধ্যে কত এবিভিপি-র দখলে?

□ ২০টি আসনের মধ্যে আমরা জিতেছি ১২টি আসনে।

মেখলিগঞ্জ কলেজে পরিষদের বিজয়ী (সাধারণ সম্পাদক) স্বদেশ রায় (ইনসেটে)

□ এর আগে কি এবিভিপি এই কলেজে সংসদ গঠন করেছিল?

□ না, এই প্রথমবার ছাত্র সংসদ দখল করলো এবিভিপি।

□ কলেজে প্রথম কাজ কি করতে চান বলে মনে করছেন?

□ প্রথমেই কলেজের বাউন্ডারি দেওয়াল নির্মাণ। সীমান্তবর্তী এলাকায় কলেজ হওয়ার কারণে যা খুব প্রয়োজন। এছাড়া আগে ক্যান্টিন ছিল না। জুন মাসে ছাত্রদের জন্য নতুন ক্যান্টিন চালু হবে। কলেজে পানীয় জলের খুব সমস্যা, কিছুদিন আগেই এর জন্য ডেপুটেশন জমা পড়েছে।

□ পড়াশোনার ক্ষেত্রে কি কি কাজ করতে চান?

□ কলেজে ভূগোল অনার্স এবং বিজ্ঞান বিভাগ চালু করতে চাই।

□ নির্বাচনে লড়তে গিয়ে কোন কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছেন?

□ তৃণমূল প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে আমরা জয়লাভ করি। ছাত্র সংসদ গঠনের দিনও বিরোধীরা ঝামেলার সৃষ্টি করেছিল কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।

□ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য কোনো ছাত্র সংগঠন না করে এবিভিপি করবে কেন?

□ তৃণমূল বা অন্য কোনো ছাত্র সংগঠন টাকা ছাড়া কিছু চেনে না। ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। তাই তাদের কাছে রাজনীতিমুক্ত কলেজ ক্যাম্পাস এবং পড়াশোনার পরিবেশ দিতে পারে একমাত্র এবিভিপি। সেজন্যেই তাদের এবিভিপির সঙ্গে থাকা উচিত।

লালপুর মহাত্মা গান্ধী কলেজে জয়ী এবিভিপি

পুরুলিয়া জেলার এই কলেজে এবিভিপি প্রথমবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে। কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০০। ছাত্র সংসদে এবিভিপি-র সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন অর্ধেন্দু শেখর রায়। স্বস্তিকার প্রতিনিধিকে ফোনে জানালেন তাঁদের কলেজের কথা।

■ **এই কলেজে মোট কতগুলি আসনের মধ্যে কতগুলি জিতেছে এবিভিপি?**

■ ২১টি আসনের মধ্যে ১৫টিতে জয়লাভ।

■ **এর আগে কি এবিভিপি এই কলেজে ছাত্র সংসদ গঠন করেছিল?**

■ না, এই প্রথমবার ছাত্র সংসদ দখল করলো এবিভিপি।

■ **কলেজে প্রথম কাজ কি করতে চান বলে মনে করছেন?**

■ কলেজে কমনরুম বলে কিছু ছিল না। সেটা চালু করেছি। ক্যান্টিনের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের যেটা অনেকদিনের অভিযোগ। তাই ১৫ দিনের মধ্যে নতুন ক্যান্টিন উপহার পাবে ছাত্র-ছাত্রীরা। এছাড়া সাইকেল স্ট্যান্ডের খুব খারাপ অবস্থা, সেটাও ভালো করার চেষ্টা করছি। নেশামুক্ত কলেজ ক্যাম্পাস গঠন করতে চাই।

■ **এছাড়া পড়াশোনার ক্ষেত্রে কি কি কাজ করতে চান?**

■ আমাদের কলেজে এর আগে কোনো ছাত্র-ছাত্রী টেস্ট পরীক্ষাগুলিতে বসত না। টিএমসিপি ক্ষমতায় থাকাকালীন এই বিষয়টি তারা কোনোদিন নজরই দেয়নি। টেস্টে না বসলেও ফাইনাল পরীক্ষাগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষায় বসার ছাড়পত্র পেয়ে যেত। এছাড়া অনার্সের ছাত্ররা ক্লাস করত না। তাই ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ৭০ শতাংশ না হলে ফাইন দিয়ে ফর্ম পুরণ করে তবেই পরীক্ষায় বসতে পারবে। আমরা অধ্যক্ষকে জানিয়েছি অনার্সের আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স নেই, সেটাও চালু করতে হবে।

■ **নির্বাচনে লড়তে গিয়ে কোন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল?**

■ আমাদের খুব ভয় দেখানো হয়েছিল। বাড়ি গিয়ে হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

■ **কারা ভয় দেখিয়েছিল?**

■ টিএমসিপি-র ছেলেরা ভয় দেখিয়েছিল। কমার্সের তৃতীয়বর্ষের প্রার্থী নবকিশোর মাহাতোর নমিনেশন ফর্ম ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তারা। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে নমিনেশন ফর্ম পুরণ করে সে।

■ **কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা টিএমসিপি, সিপি ও এস এফ আই না করে এবিভিপি করবে কেন?**

■ টিএমসিপি বা অন্য ছাত্র সংগঠনগুলির মতো এবিভিপি শিক্ষাঙ্গনে কোনো হিংসার পরিবেশে বিশ্বাস করে না। এবিভিপি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। এছাড়া আগে কলেজে কোনো উন্নয়ন হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শুধু টাকা তোলা হোত। এমনকী আইডেনটিটি কার্ড করে দেওয়ার নামেও টাকা তোলা হোত। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা এবিভিপি-র দিকে ঝুঁকেছে।

■ **নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কোনো বাড়তি পাওনা?**

■ (হাসি) বাড়তি পাওনা বলতে একটাই আছে। আমরা ভোটে জিতে ছাত্র সংসদ গঠন করেছি।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

চিঠিপত্র

সরোজিনী নাইডু

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংখ্যা স্বস্তিকায় রূপশ্রী দত্ত লিখিত ‘প্রথম মহিলা রাজ্যপাল সরোজিনী নাইডু’ শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়লাম। এই প্রসঙ্গে আমি দু’টি কথা বলতে চাই। সরোজিনী নাইডু বাঙালি বলে আমরা গর্ব করি। কিন্তু সে গর্ব ভিত্তিহীন। তাঁর পরিচয় এইটুকু যে তিনি বাঙালির মেয়ে। তার বেশি নয়। বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে তিনি কোনো যোগাযোগ রাখেননি। তিনি উর্দু, তেলুগু, পার্শী ইত্যাদি ভাষা শিখেছিলেন, কিন্তু বাঙালির মেয়ে হয়েও বাংলা শেখেননি বা তাঁর ছেলে-মেয়েদের শেখাননি। তিনি রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে উত্তর ও পশ্চিম ভারতীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। জিন্না, গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, পন্থ প্রমুখ নেতার সঙ্গে সব সময় ওঠাবসা করেছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বাংলার নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি। ১৯৪৩ সালে বাংলার দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬ সালে কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গা, ১৯৪৭-৪৮ সালে দেশভাগজনিত বিপর্যয় ইত্যাদি কোনো ঘটনায় তিনি বাংলায় আসেননি বা এতটুকু উদ্বেগ প্রকাশ করেননি। ১৯৩৯ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার ব্যাপারে গান্ধীপন্থীরা তাঁকেই ব্যবহার করেছিলেন। এজন্য তিনি সেদিন বাঙালিদের ঘৃণা কুড়িয়েছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি কোনো বিশেষত্ব দেখাতে পারেননি, যেমন দেখিয়েছিলেন অ্যানি বেসান্ত বা সরলাদেবী চৌধুরানী।

—**কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী,**
কলকাতা-৩০।

অধ্যাপক শেলডনের বিভ্রান্তি

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শেলডন পোলক সম্প্রতি বলেছেন, ‘ওঁরা (মুসলমান শাসকেরা) জোর করে ধর্মান্তরিত করলে এদেশে (ভারতে) একজনও হিন্দু থাকত না।’ ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সত্যের খাতিরে বলতে হচ্ছে যে তাঁর এই উক্তি বিভ্রান্তিকর। খৃষ্টত্বের মত ইসলামও তত্ত্বে ও প্রয়োগে ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাসী। সৌদি আরব, সোমালিয়া, মৌবিতানিয়া ও মালদিভস্— এই চারটি মুসলমান রাজ্যে একজনও হিন্দু বা অমুসলমান নেই। সকলকেই তারা ধর্মান্তরকরণ করে প্রায় ১৪’শ বছরের মধ্যে মুসলমান করে ফেলতে পেরেছে। আর পাঁচটি রাষ্ট্রে তারা ধর্মান্তরকরণ করে করে ৯৯ শতাংশ মানুষকে মুসলমান করেছে। তাদের আছে মোট ৫০টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ যার ২৫টিতে আজ শতকরা ৯০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশ মুসলমান। আমাদের হাতে যে তথ্য আছে তা থেকে জানা যায় তা হলো বল প্রয়োগে আতঙ্ক সৃষ্টি করে হিন্দুদের মুসলমান করা ছাড়া জিজিয়া কর ধার্য দ্বারা, জঙ্গল জমি প্রজাদের মধ্যে বিতরণের প্রলোভন দ্বারা, সুফি, পীরদের দ্বারা কৃষক, জেলে, তাঁতি ও সাধারণ সাধারণ হিন্দুদের বিভ্রান্ত করে ধীরে ধীরে শত শত বছর ধরে ধর্মান্তরকরণ করা হয়েছে। আজ চলছে লাভ জিহাদ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। অতীতের অখণ্ড ভারত আজ আর নেই। ৬৩৬-’৩৭ সাল থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল আফগানিস্তানে, সিন্ধুতে, পাঞ্জাবে মুসলমান আক্রমণ, অভিযান ও জিহাদ চলেছে, চলেছে বলপূর্বক হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ। মহম্মদ বিন-কাসিম, সুলতান মামুদ (তার ১৭ বার ভারত অভিযান)। তৈমুরলঙের অভিযান ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ চলেছে। তাই আজ ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল, আফগানিস্তান প্রায় হিন্দু শূন্য। ৯৯ শতাংশ হিন্দুকে মুসলমান করা হয়েছে। পাকিস্তানেও তাই, ৯৭ শতাংশ হিন্দুকে আজ মুসলমান হতে হয়েছে। বাংলাদেশেও এখন মাত্র ৮ শতাংশ হিন্দু আছে অর্থাৎ ৯২ শতাংশ হিন্দুকে মুসলমান করা হয়েছে, অথচ বাংলায় মুসলমান আক্রমণের পূর্বে মুসলমান সমাজই ছিল না। বাংলাদেশে প্রতি দশকেই হিন্দু কমছে শতকরা হিসাবে। ভারতে ধর্মান্তরকরণে বলপ্রয়োগ যে হয়নি এই প্রচার ডাহা অসত্য প্রচার। তৈমুরের অভিযানের সময় জম্মুর পরাজিত রাজা প্রাণভয়ে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন। বলপ্রয়োগ সহ আরও কত পদ্ধতিতে যে হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। জিজিয়া কর ধার্য করে বহু গরিব হিন্দুকে মুসলমান করা হয়েছে। দু’ হাজার বছর ধরে যে ধর্মান্তরকরণ চলছে, দেশে দেশে স্বদেশীদের জাতিসত্তা বিনাশ চলছে— এর চর্চা, গবেষণা, জনগণনায় হিসাব রাখা, ইতিহাস লেখা হয় না ধর্মান্তরকরণীদের স্বার্থে যাতে হিন্দুদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি না হয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক পোলক এ বিষয়ে যদি কোনো গবেষণা গ্রন্থের উল্লেখ করতেন যে ভারতে ধর্মান্তরকরণে কোনো বল প্রয়োগ হয়নি তাহলে ভারতবাসী হিসাবে আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হতাম। কিন্তু কোনো তথ্যের উল্লেখ না থাকায় হতাশ হয়েছি।

বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের তথ্য আছে এমন কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করলাম—

(১) Dr. B.R. Ahmad Kar, *Writings and Speeches* Vol. 8.p.58. (২) চাচ-নামা। (৩) Dr. H.C. Kar, Military History of India. (৪) তৈমুরের আত্মজীবনী, Firma KLM. (৫) J.N. Sarkar, History of Anzangzip, Vol. 3. (৬) J.N. Sarkar, A Short History of Aurangjib. (৭) K. Gough, 'Indian Peasant Uprisengs in A. R. Dsai (ed.) Peasant Struggles in India p. III.

—**ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার,**
দমদম পার্ক, কলকাতা-৫৫।

ইসলাম শান্তির ধর্ম - ইতিহাস কী বলে?

বিশেষ দু’ একটি পত্র পত্রিকায় ও বিভিন্ন সভায় কিছু লেখক ও বক্তা নানা ভাবে ‘ইসলাম’ শান্তির ধর্ম বলে প্রচার করেন।

সেই লেখক ও বক্তারা নিশ্চিতভাবেই সত্য কথা বলেন না। এদের মধ্যে মুসলমান যাঁরা আছেন তাঁদের মানসিকতাটা স্পষ্ট। তাঁরা সত্যটাকে জেনেও প্রকাশ করেন না। তাঁরা অপর ধর্মাবলম্বীদের ধোঁকা দিতে চান। কিন্তু হিন্দু লেখক বা বক্তাগণ হয় আহাম্মক অথবা পয়সা পেয়ে ওই অপকর্মটি করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় মিথ্যা প্রচারকারীগণ অতীত ও বর্তমানের সন্ত্রাসি ও জঙ্গি মুসলমানদের কার্যক্রমকে ইসলাম বহির্ভূত বা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যাকারক বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু বাস্তব ও প্রকৃত সত্য হচ্ছে সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যাবলীকে 'জেহাদ' বলে ধর্মের অঙ্গ বলে কোরানে স্পষ্ট ভাষায় উৎসাহিত করা হয়েছে। একথা সত্য যে, কোরানে কিছু ভাল কথা আছে। কিন্তু সেই ভাল কথাগুলি বিশ্ব মানবের সপক্ষে বলে না। এবং মুসলমানদের কোনো কল্যাণ সাধনও করে না, ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই তা প্রমাণিত হবে। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লুণ্ঠিত নারী ও সম্পদ (সালে গণিমত) ভোগের লোভ দেখিয়ে ইসলাম যে হিংসার আগুন জ্বেলেছে বুমেরাং হয়ে যে আগুন তাদেরকেও রেহাই দেয় না, তার সাক্ষী ইতিহাস। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর যথাক্রমে আবু বক্কর, ওমর, ওসমান ও জাঠতুতো ভাই এবং জামাতা আলি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, যাদেরকে শ্রেষ্ঠ খলিফা বা 'খোলাফায়ে রাশেদিন' বলা হয়। এই শ্রেষ্ঠ খলিফাদের মধ্যে একমাত্র আবুবক্কর ব্যতীত বাকি তিনজনই হত্যার শিকার হয়েছিলেন। হত্যাকারীরা সকলেই মুসলমান।

নবি মহম্মদ মক্কা হতে পালিয়ে মদিনায় আসেন ৬২২ খৃষ্টাব্দে। তার পূর্ব হতেই সেখানে প্রধানত ইহুদি ও খৃষ্টানরা বাস করতেন। কিন্তু মহম্মদ এসে ক্রমে তাদের নানাভাবে ধর্মান্তরিত, হত্যা ও বিতাড়নের দ্বারা সেখানে নিরঙ্কুশ ইসলামের প্রভুত্ব কায়েম করার চেষ্টা করেন। মহম্মদের ইসলাম প্রচারের শুরু হতে আজ পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস যুদ্ধ ও রক্তপাতের নিষ্ঠুর কাহিনি দিয়ে ভরা। তার কারণ অসহিষ্ণুতা, অপর ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ কোরানে অজস্র। আগ্রহী পাঠক কোরানের ২/৩৯, (২/১৯৩), (২/১৯৩), (৩/১৯), (৩/১৪২), (৪/৭৪), (৮/১২), (৯/২৮) আয়াত (বাক্য)-গুলি দেখে নিতে পারেন।

সুতরাং যাঁরা 'জেহাদ'-এর বানানো মনোরম ব্যাখ্যা করছেন তাঁরা মিথ্যাচার করছেন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে কোরান স্বীকৃতি দেয়নি এবং সৎ অসৎ নির্বিশেষে সকল অমুসলমানকে অনন্তকালের জন্য 'দোজখ' (নরক) বাসের ফতোয়া দেয়।

আমি বিশ্বাস করি মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসী নয়। কিন্তু যারা ধর্মের নামে নরহত্যা ইত্যাদি নিষ্ঠুর কাজ, এমনকী নিজের জীবনও বিসর্জন দিচ্ছে তারা কোরান নির্দেশিত ও বেহেশত প্রলুব্ধ হয়েই এসব করছে এবং তারা অবশ্যই মুসলমান। আর এটাই দুঃখজনক সত্য যে, প্রায় সকল মুসলমান ওই সব নারকীয় কাণ্ডগুলি দেখেও মৌন থাকছেন। অন্তত নিন্দা করছেন না। ইসলাম শান্তির ধর্ম হলে তাঁরা তা করতেন।

—**কমলাকান্ত বণিক,**
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

ইদ্রিস মিঞার অপকীর্তি

মমতা গ্রেপ্তার হলে পশ্চিমবঙ্গে আগুন জ্বলবে বলার পর ইদ্রিস মিঞা আবার বিজেপি-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করেছে। বসিরহাটে এক সভায় সে বলে বিজেপি নেতারা সব পাগল। বাদুরিয়ার চণ্ডীপুর গ্রামে জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কুলাঙ্গার ও দেশদ্রোহী বলে কটাক্ষ করেন। কিন্তু কংগ্রেস এম এল এ থাকাকালীন সে এস পি-র কাছে একজন মুসলমান বডিগার্ড চায়। উপযুক্ত মুসলমান বডিগার্ড না পেয়ে এসপি একজন হিন্দু বডিগার্ড পাঠায়। সেই হিন্দু বডিগার্ডকে ফেরত পাঠিয়ে দেয় ধর্মনিরপেক্ষ ইদ্রিস। পরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একজন মুসলমান বডিগার্ড পাঠান এসপি সাহেব।

২০০৪ সালে লোকসভার ভোটের আগে বাজপেয়ী প্রচুর অর্থ ব্যয় করে হেমায়েত কমিটি গঠন করেন। তাদের কাজ ছিল মুসলমানরা যাতে এনডিএ-কে ভোট দেয় তার প্রচার করা। তার ফল হলো ২৪ এপ্রিল ২০০৪ কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের শাহি হলে বৈকাল ৩টায় সভা আরম্ভ হতে না হতেই অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি ফোরামের চেয়ারম্যান এই ইদ্রিস আলির নেতৃত্বে একদল মৌলবমাদী মুসলমান গুণ্ডা সভা পণ্ড করে দেয়। শাহি হলটার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো কুচি কুচি কাগজের টুকরো, তার কোনো একটাতে বাজপেয়ীর নাকের একাংশ, কোনোটাতে চোখের একাংশ। বিধ্বংসী বিক্ষোভ এবং মারমুখী মৌলবাদী মুসলমান গুণ্ডাদের কোপে পড়ে হেমায়েত কমিটির নেতারা হোটেল থেকে পালিয়ে বাঁচেন। ২১ নভেম্বর ২০০৭ তসলিমাকে বিতাড়নের জন্য ইদ্রিসের নেতৃত্বে একদল মৌলবাদী মুসলমান গুণ্ডা মধ্য কলকাতার এন্টালি, পার্কসার্কাস, তপসিয়া, বেনিয়াপুকুর, কড়েয়া, রিপন স্ট্রিট, মৌলালি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট, গাড়ি ও হিন্দুর দোকানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই গুণ্ডাদের কাছে মাথানত করে বামসরকার তসলিমাকে কলকাতা থেকে বিতাড়িত করে। পুলিশ ইদ্রিস মিঞা সহ ৩২ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং চার্জশিট দেয়। সুযোগসন্ধানী ইদ্রিস কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেয়। দীর্ঘদিন মামলা চলার পর তৃণমূলেশ্বরী মামলাটি তুলে নেন। কারণ এরা সকলেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। এই গুণ্ডামির জন্য এদের প্রত্যেকের শাস্তি পাওয়া খুবই জরুরি ছিল। কিন্তু তারা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল।

শুনেছি বিজেপির একটি লিগেল এড সেল আছে। তাদের কাছে বিনীত আবেদন তারা যেন হাইকোর্ট মামলা করে কেসটা পুনরায় আরম্ভ করা যায় এবং দোষীরা শাস্তি পায় তার ব্যবস্থা করেন।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

বুদ্ধাবতার

আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

ভগবান বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব। কান্তকবি জয়দেব তাঁর ‘দশাবতার স্তোত্রম্’-এ লিখেছেন--- ‘নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্। সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্। কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে।।’ মহাভারতের যুদ্ধে প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হলো। ভালো মন্দ সকলেই মরলো। সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ল। সমস্ত দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। ব্যক্তিবাদ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, প্রাদেশিকতা প্রবল হয়ে উঠল। ব্যাপক রাষ্ট্রভাবনার চেতনা লুপ্ত হলো। ধর্মের দিকেও অবনতি দেখা দিল। স্বর্গলাভের জন্য যাগযজ্ঞের আয়োজন বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের যজ্ঞের সুসংহত রূপটি নষ্ট হলো। সকলেই মন্ত্র পড়ে আগুনে ঘি ঢেলে দিয়ে ভাবলো যজ্ঞ করছি। ফলে যজ্ঞের সমাজহিত ও যথার্থতা নষ্ট হলো। পূজা, সংহতিরক্ষা, দান যেগুলি একসময় যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ ছিল, এখন সেগুলি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলল। এসবের তাৎপর্য ও চরিতার্থতা সমাজ বিস্মৃত হলো। পশুমাংসের লোভে লোকে ‘পশুযাগ’ করতে লাগল। এইভাবে বৈদিক যজ্ঞের অবনতি ঘটল। এমনই এক বৌদ্ধিক ও সামাজিক অরাজক পরিস্থিতিতে ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হলেন। তিনি সমাজে নতুন চিন্তাধারা প্রবাহিত করলেন। ভারতবর্ষ আবার জেগে উঠলো।

বুদ্ধদেবের আগমনের সময় মানবীয় কর্তব্য ও কার্য-কারণ ভাব সকলে ভুলে গিয়েছিল। তাই বুদ্ধদেব বলেছিলেন-‘শুধু দৈব কিংবা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করা নিরর্থক। নিজ কর্মেই তারণ অথবা মারণ হতে পারে। কেবল কর্মফলই ভোগ করতে হয়।’ বুদ্ধদেব লুপ্তপ্রায় কর্মচেতনা জাগিয়ে সমাজের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। যাগযজ্ঞের নিষ্প্রাণ-নিষ্প্রভ কর্মকাণ্ডে নিহিত হিংসার পরিবর্তে কর্মের সাত্ত্বিক আনন্দের কথা তিনি প্রচার করেন। তাঁর লক্ষ্য সরল, সবল ও একমুখী ছিল। যাগযজ্ঞের বিরোধী বুদ্ধদেব যখন জানলেন, বেদ যাগযজ্ঞের কথা বলেছে, তখন তিনি বেদবিরোধী হয়ে উঠলেন। কিন্তু বেদ তো ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ চিন্তার প্রেরণা দেয়। বুদ্ধদেব বোধহয় বেদের এই কল্যাণকর দিকটি দেখতে পাননি। বীজ যত ভালোই হোক না কেন রোপণের জন্য তাকে ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। ভারতে বেদের স্থান অতি উচ্চে। বেদ অধ্যয়নে অতীতের মহান কর্মবীরদের কৃতি-কর্তব্য মনের মধ্যে জেগে ওঠে। তাই বেদের অনাদরের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের নৌকোটিও ডুবতে বসেছে। বুদ্ধদেব পূর্ব-পরম্পরার কেবল বিরোধিতা করেনি, তা পালন করতে নিষেধও করেছেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য অনুগামীরা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়েছিল। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগেও ভারতে অনেক মত ও পথ প্রচলিত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর অনুগামীদের সমাজ থেকে স্বতন্ত্র করার জন্য তাদের পৃথকভাবে সংগঠিত করেন এবং একটি সুব্যবস্থিত প্রচার তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন। ফলে তাঁর মতবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করে। বিশ্বে বুদ্ধই প্রথম ধর্ম প্রচারক। তাঁর অনুগামীরা ধর্ম প্রচারকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করতেন। ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতে এবং বহির্ভারতে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করলেও আচার-ব্যবহারে কোনো পার্থক্য দেখা গেল না। বুদ্ধের পূর্ববর্তী লোকেরা যদি ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের আশায় সহিংস যজ্ঞ করে থাকে, এখন লোকেরা নিজ নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে লাগল। সমগ্র সমাজের কথা ভাববার কেউ রইল না। সমাজের জন্যে সমষ্টি জীবনকে পুনর্জীবিত করার, জাতীয় কল্যাণের জন্য জাতীয় শিক্ষার আবশ্যকতাকে বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়নি।

ভগবান বুদ্ধ সাধন সম্বন্ধে বৈরাগ্যবান ছিলেন। তাঁর হৃদয় বিশাল ছিল। কাজেই জাতীয়তাবোধ তাঁর কাছে ক্ষুদ্র কল্পনা বলে মনে হোত। আপন হৃদয়ের বিশালতার জন্য তিনি বোধহয় সমাজের বাস্তব অবস্থাটি বোঝেননি। তিনি ব্যক্তি-বিকাশের কোনো ব্যবস্থা না করেই সকলের জন্য এক প্রব্রজ্যার বিধান দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পরিনির্বাণের কিছুকাল পরেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ নীতিহীনতা দেখা গেল। একদিকে সমাজ-নিরপেক্ষ সম্প্রদায়নিষ্ঠ জীবন, অন্যদিকে বৌদ্ধ বিহারে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি— এই দুয়ের সম্মিলনে সমগ্র সমাজে অবনতির আশঙ্কা দেখা দিল। একদিকে পূর্ববর্তী ঐতিহ্য পরিত্যাগ, অন্যদিকে সমাজের ক্রমবিকাশের কোনো ব্যবস্থা না করা— এই দুইয়ের ফলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ল। রাজনৈতিক জীবনে এর পরিণাম ভয়াবহ হলো। ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হলো। ব্যাক্ট্রিয় যবন সম্রাট দিমেত্রিয়াস্ ভারত আক্রমণ করেন। কলিঙ্গ সম্রাট খারবেল তাঁকে

প্রতিহত করেন। সেই সময় বৌদ্ধরা 'অহিংসা পরম ধর্ম' বলে এই বিদেশি আক্রমণ প্রতিরোধের বিরোধিতা করেন। ফলে সারা দেশে বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধে জনচিত্তে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হলো। বৌদ্ধমত লোকসমাজে নষ্ট প্রায় হয়ে গেল। বৌদ্ধমত এতদূর প্রসার লাভ করেছিল যে, এদেশ আক্রমণকারী বিদেশিরা দেশীয় লোকেদের প্রতিরোধ শিথিল করার জন্য নিজেরাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতো। কুষাণ সম্রাটরা এই জন্যই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এইভাবে ভারতবর্ষ বুদ্ধদেবের উপদেশনা সঠিকভাবে গ্রহণ না করতে পারায় ধীরে ধীরে দেশকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করে তুলল।

এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য বৈদিকধর্মের পুনরুত্থান দেখা দিল। সমাজে প্রাচীন জাতীয়তাবোধের ঐতিহ্যে জাতীয় জীবনে সংস্কার শুরু হয়ে গেল। এই মহান কার্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন— চাণক্য, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সম্রাট বিক্রমাদিত্য, সম্রাট শালিবাহন, দশাশ্বমেধ যজ্ঞকারী সম্রাট ভারশিব , সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, সম্রাট হর্ষবর্ধন, সম্রাট পুলকেশী, সম্রাট রাজেন্দ্র চোল প্রমুখ। এই সব রাজার কঠোর পরিশ্রমের ফলে শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছিল। এই সময়েই বৌদ্ধদের দ্বারা অবদমিত জাতীয়তা বোধ পুনর্জাগরিত হয়ে উঠল। ভারত আবার বৈভবশালী দেশে পরিণত হলো। উন্নতির চরম শিখর স্পর্শ করল। এই সময়েই ভারতের কীর্তি বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছিল। তাই দেশি-বিদেশি ইতিহাসবিদরা এই কালপর্বকে ভারতের স্বর্ণযুগ বলেন। মহামতি চাণক্য এই প্রবল পুরুষার্থ-সম্পন্ন বৈভব পরম্পরার সূচনা করেন। আর শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য তা সম্পূর্ণ করেন। পুরুষার্থ কথার অর্থ— ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চার মার্গে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে জীবন সুসম্পন্ন করাকে পুরুষার্থ বলে। এখানে 'পুরুষ' মানে পাশ্চাত্য চিন্তার মেল নয়, এর অর্থ মানুষ Human being; নারী-পুরুষ উভয়েই। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের মাধ্যমে ভারসাম্য হয়। সমাজ জীবনের বিকাশ সাধনই ভারতের সমাজধর্মের মূল কথা। যাহোক, এই সময়ে প্রত্যেক লোককে আশৈশব সৎ সংস্কার দেওয়ার সামাজিক প্রথা প্রচলিত হয়। স্বদেশ ও সমাজ দেখার জন্য, জানার জন্য চার তীর্থধাম ভ্রমণের রীতি এই সময়েই শুরু হয়। প্রাচীনকালের ইতিহাস পুনর্লিখিত হয়। অঞ্চল, মত-পথ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মন থেকে সঙ্কুচিত ভাবের পরিবর্তে অখিল ভারতীয় চেতনা বিকাশের জন্য সর্বভারতীয় ভাষা সংস্কৃত এই যুগেই পুনর্জীবিত হয়। ভারত এই সময়েই মহাভারত হয়ে ওঠে। অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি, পুরাণ এই সময় লেখা হয় এবং সূত-চারণ-কথকঠাকুরদের মাধ্যমে তা সমগ্র ভারতে প্রচারিত হয়। এইভাবে তত্ত্বে ও প্রয়োগে রাষ্ট্র-ভাবনা দেখা দেয়। তীর্থযাত্রাদি তথা প্রত্যেক নিত্য ও নৈমিত্তিক উৎসবাদির বিধিবিধানের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবোধ, একাত্মতাবোধ সগুণ-সাকার মূর্তিরূপে প্রত্যেকের হৃদয়ে ফুটে ওঠে। তাই পঞ্চম বেদ মহাভারতে ভারতের অখণ্ডতা ও সামাজিক কর্তব্য বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছে। এইসব কথা পাছে কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যায় সেজন্য মহাভারতের শেষে 'ভারত-সাবিত্রী' নামে চারটি শ্লোক আছে যাতে মহাভারতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ভারত-সাবিত্রী স্তোত্র অন্য কথায় বিশুদ্ধ সমাজধর্মের কথা।

এই যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, সমাজহিতের উক্ত নবীন পদ্ধতিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। সমাজের সকল মানুষকে কাম্য লোক সংস্কারের পথনির্দেশ দেবার জন্য দেশব্যাপী বিচরণশীল নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এই সম্প্রদায় দশনামী সম্প্রদায় নামে খ্যাত। দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা তীর্থে-তীর্থে পরিভ্রমণ করে লোক সংস্কারের পথনির্দেশ দিতেন তাঁরা 'তীর্থ'। যাঁরা আশ্রম বা মঠে অধিষ্ঠান করে ধর্মসংস্কার দিতেন তাঁরা 'আশ্রম'। যাঁরা বনে বাস করে বনবাসীদের সংস্কার করতেন তাঁদের উপাধি 'বন'। যাঁরা অরণ্যে বসবাসী মানুষদের মধ্যে সংস্কার প্রচার করতেন তাঁরা 'অরণ্য'। পার্বত্য প্রদেশে যাঁরা ভ্রমণ করে সংস্কার প্রচার করতেন তাঁরা 'গিরি'। সাগরতটে যাঁরা ধর্মসংস্কার কার্য করতেন তাঁরা 'সাগর'। দুর্গম পর্বতে যারা প্রচারকার্যে যেতেন তাঁরা 'পর্বত'। সারস্বদ্বর্গের সঙ্গে যাঁরা ধর্মসংস্কার নিয়ে আলোচনা করতেন তাঁর 'সরস্বতী'। নগরে যাঁরা উপদেশ দিতেন তাঁরা 'পুরী'। আর সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে যাঁরা ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতেন তাঁরা 'ভারতী'।

এই দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের কার্যের মধ্য দিয়ে ধর্ম ও জাতীয়তাবোধ মানুষের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেকালের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে এই ধরনের পরিকল্পনা সফল করতে একদল স্থায়ী শিক্ষকের প্রয়োজন হয়েছিল। এই শিক্ষকদের বলা হোত 'ব্রাহ্মণ'। এইসব ব্রাহ্মণদের ভরণ-পোষণের জন্য রাজা ভূমি দান করতেন। এই যুগেই ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যবর্ণের লোকেদের সন্ন্যাস আশ্রমের মাধ্যমে সমাজগুরুর আসনে বসানো হয়েছিল। ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ সকল সন্ন্যাসী গৈরিক বস্ত্রধারী এবং সমাজে শ্রেষ্ঠস্থানের অধিকারী ছিলেন। ভগবানবুদ্ধের প্রচার তন্ত্রের ত্রুটিগুলি সংশোধন করে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের, ভারতীয় জাতীয়তাবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। ফলে ভারতীয় সমাজ ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য শঙ্করের মিলিত শ্রমের ফলশ্রুতি। বুদ্ধের উদার ভাবনা ও প্রবল কর্মপ্রেরণা, শঙ্করের প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও দর্শন সংগঠনের সম্যক পথনির্দেশ— এই দুয়ের মিলিত রূপ বর্তমান হিন্দু সমাজ ও ভারতবর্ষ। বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্যের মধ্যে অনেকেই বিধেয়-বিরোধ দেখেন, কিন্তু তাঁদের একজন সংস্কারবাদী ও অপরজন পুনরুত্থানবাদী হলেও বাস্তবে এঁদের কোনো বিরোধ নেই। এঁদের ভূমিকা পরস্পর পরিপূরক।

ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে নবম অবতার হিসেবে বুদ্ধদেবকে স্বীকার করার রহস্য এছাড়া আর কি-বা হতে পারে?

‘বুনো’ রামনাথের স্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপ অতি প্রাচীনকাল থেকে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। দেশ-দেশান্তর থেকে এখানে বহু ছাত্র ও শিক্ষক সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতে এসেছিলেন। নানা শাস্ত্রে পণ্ডিতদের আবাসভূমি এই নবদ্বীপ।

সংস্কৃত শিক্ষার টোলগুলিই নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত অভয়রাম তর্কভূষণের পুত্র রামনাথ নবদ্বীপে অধ্যাপনা করতেন। শহরের কোলাহল থেকে দূরে বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ শান্ত বনভূমির কাছে এক নিভৃত কুটিরে বাস করতেন বলে তিনি ‘বুনো রামনাথ’ নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাসস্থানের কিছুটা দূরে ভাগীরথী কুলকুল রবে বয়ে চলেছে। রামনাথ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। আর্থিক দুরবস্থার জন্য তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী ছাত্রদের প্রতিপালন করে শিক্ষাদানের ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবে তাঁর জীবনের ব্রত ছিল শিক্ষাদান। তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিক্ষারীতিতে মুগ্ধ হয়ে ছাত্ররা কোনো রকমে ভরণপোষণ নিজেরা চালিয়েও তাঁর টোলে অধ্যয়ন করতে আসত। দারিদ্র্য ছিল রামনাথের ভূষণ। তাঁর সহধর্মিণীও ছিলেন স্বামীর মতোই সন্তুষ্টচিত্ত। তাঁদের সাদাসিদে অনাড়ম্বর জীবনে দারিদ্র্য কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি।

সে সময়ে রাজরাজড়ার উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যেই টোলগুলি চলত। তখন কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শিক্ষার অনুরাগী। নবদ্বীপের সব টোলের প্রধান অধ্যাপকদের জন্য বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। রামনাথ কখনো রাজার কাছে বৃত্তির জন্য আবেদন না জানালেও কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা জানতেন। একদিন রাজা স্বয়ং বৃত্তির প্রস্তাব নিয়ে রামনাথের টোলে উপস্থিত হলেন। দেখলেন গাছ-গাছালিতে ঘেরা বনভূমি সংলগ্ন এক ছোট কুটির, নিকানো আঙিনা, গৃহিণী গৃহকর্মরতা। পণ্ডিত রামনাথ পাঠ্যাভ্যাসে মগ্ন। এই শুচিশুদ্ধ পরিবেশে মুগ্ধ রাজা এগিয়ে গেলেন। এত বড় পণ্ডিত ব্যক্তিকে সাদামাটা ভাষায় আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচবোধ করে তিনি রামনাথের সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলেন যে তাঁর কোনো অনুপপত্তি (অভাব) আছে কিনা। নির্লোভ জ্ঞানতপস্বী ও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটু আত্মভোলা হয়, তাই রামনাথ ভাবলেন শাস্ত্র বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অসুবিধে আছে কিনা রাজা তাই জানতে আগ্রহী। তিনি শান্ত ও ধীরভাবে উত্তর দিলেন, শাস্ত্রচর্চায় এখনো তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হননি। তখন নিরুপায় হয়ে রাজা সরাসরি তাঁর আর্থিক প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করায় সদাপ্রসন্ন রামনাথ উত্তর দিলেন এদিকেও তাঁর কোনো অভাব নেই। সামনেই তেঁতুল গাছ, গৃহিণী সেই পাতা সেদ্ধ করে দেন, আর তাই স্বামী-স্ত্রী পরমানন্দে আহার করেন।

তাঁর স্ত্রীও সদাই স্বামীর অনুগামী পার্থিব দুঃখ-কষ্ট তাঁর মনের প্রশান্তি নষ্ট করতে পারেনি। তিনি ছিলেন স্বামীগর্বে গর্বিতা এক তেজস্বিনী নারী। ভারতীয় আদর্শ নারীর মতো স্বামীর সুখেই তাঁর সুখ, স্বামীর সম্মানেই তাঁর সম্মান। এ বিষয়ে জনশ্রুতি যে, একবার তিনি নদীতে স্নান সেরে উঠেছেন এমন সময় কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির জনাকয়েক মহিলাও ওই ঘাটে স্নানের জন্য এসে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, ফলে নদীর জল ছিটকে এসে রামনাথের স্ত্রীর শাড়ি ভিজিয়ে দেওয়ায় তিনি তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান। ওই মহিলারা তাঁর হাতে লাল সুতো লক্ষ্য করে ব্যঙ্গভরে বলে উঠল যে, যাঁর দু’গাছা শাঁখা কেনারও সামর্থ্য নেই, শাখার বদলে হাতে লালসূতো বাঁধতে হয়েছে তাঁর আবার এত দেমাক! স্বামীর অসচ্ছলতার ইঙ্গিতে আহতা ফণীর মতো ফুঁসে উঠলেন তিনি। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন ‘এ হাতে এই লালসুতো (সধবার চিহ্ন) যতদিন থাকবে ততদিনই নবদ্বীপের গৌরব বজায় থাকবে, আর যখন হাতে এ সুতো থাকবে না তখন নবদ্বীপের গৌরব ম্লান হয়ে যাবে। সকলে হায় হায় রবে কাঁদবে।’ স্বামীর অপমান তাঁর কাছে বজ্রাঘাততুল্য ছিল।

এমন তেজস্বিনী নারীর নামটিও আমাদের কাছে অজানা রয়ে গেছে। তবে আত্মমর্যাদাবোধের পরিচায়ক এ কাহিনী তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

(শিবানী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বরণীয়াদের পদপ্রান্তে’ গ্রন্থ)

চিরদিনের গল্প

নবাঙ্কুর

রাজকন্যা

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

দূত তবু যায় দেশের পর দেশ।

শান তরোয়াল পরখ করে এক রাজপুত্র...দাঁড়িয়ে এক পাহাড়ের উপরে।

রাজপুত্রের তেজে, চারিদিকের রাজ্য থর থর।

দূতের মুখে শুনে রাজপুত্র আশ্চর্য হয়ে বললে, 'আচ্ছা!'

সব রাজা-রাজপুত্রকে জড়ো করে রাজপুত্র বললে, 'কত মানুষ জীয়ে মরে আমার কথায়, কাঠের রাজকন্যা কিসে জীয়োবে, সন্ধান দাও।'

এক রাজা বললেন, 'শুনেছি, চম্পকবনে এক রাজহাঁস। তার কপালে এক তিলক। সেই তিলকে তিলক দিলে কাঠের কন্যা জীয়োয়।'

যত রাজা রাজপুত্র সৈন্য সামন্ত দলবল নিয়ে রাজপুত্র চলে, কোথায় চম্পক বন। সাত বৎসর সাত মাসে কত রাজার রাজত্ব উজাড় গেল, চম্পক বন থাকে তো হাঁস থাকে না, হাঁস থাকে তো চম্পক বন নেই।

চলে রাজপুত্র কাঠকন্যার দেশে।

তিন তেরো ছত্রিশ বছর যায়। সে দেশের লোক তখন খায় দায় ঘুমায়, গান গায়।

গান গায়। কাঠকন্যা জীয়ে না!

পদ্ম-পাপড়ি ভরে বুকের রক্ত চিরে দেয় রাজপুত্র, কাঠকন্যাকে স্নান করাও।

স্নান আর টান! গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে। যায় শরৎ, যায় শীত। কাঠকন্যা, কাঠকন্যা!

'যাক্! ... নিশ্বাস ছেড়ে, মুকুট নুইয়ে, সাথী বন্ধুর সাথে রাজপুত্র ফিরে গেল আপন রাজ্যে।

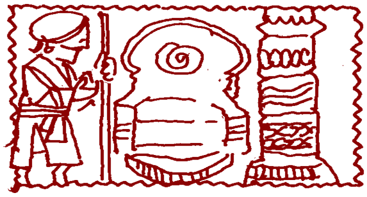

শেষে এক বনের হাঁস কেটে নিয়ে রাজপুত্র দলেবলে এল রাজকন্যার দেশে।

ভয়ে রাজা অস্থির। কন্যার ঘরের ফুলের মালা খুলে ফেললেন।

খুললেই কি?

হাঁসের ঠোঁট কেটে রাজপুত্র, দলবল সঙ্গে তিলক পরিয়ে দেন রাজকন্যার কপালে।

সাত সাত তিন-সাত দিন। বায়ান্ন রাত। আছে আর থাকে। যে কাঠ সে কাঠ।

'হঠ!'—বলে রেগে গিয়ে রাজপুত্র, পুরীর সাত চূড়া ভেঙে ফেলে পুকুর সায়র বুজিয়ে, তার উপর দিয়ে ফিরে চললে দলেবলে।

চুপি চুপি যায় দূত।

ছোট্ট ফুলের বন। ফুল হাতে এক রাজপুত্র, বেড়ায় ঘুরে। ভুলবনে আর রাজপুরী জুড়ে পাখির গান, লোকজনের কলরব।

দূত মাথা নোয়ায়।

দূতের কাছে সব শুনে টুনে, রাজপুত্র বলে, 'আচ্ছা!'

রাজ্যের লোকজন পাখ-পাখালি খায় দায়, হাসে খেলে গান গায়। রাজপুত্র বলে, 'আহা কাঠকন্যার রাজ্য কাঠ হয়ে থাকবে?'

রাজপুত্র সাথী ডাকে, বন্ধু ডাকে।

সাথীরা বলে, 'গাছের ফুল গাছের ফল ধান শস্য বিলিয়ে দাও।'

বন্ধুরা বলে, 'রাজভাণ্ডার বিলিয়ে দাও।'

বলে রাজপুত্র, 'গায়ের রক্ত বিলোলে যদি জীয়ে তাও দি।'

দূত চলে।

এক সাদা ঘোড়া, টগবগ। ঘুরিয়ে ঘোড়া, রাজপুত্র থামে, 'কে তুমি?'

মাটি ছুঁয়ে, দূত আথি বিথি মুখ খোলে।

শুনে সব, রাজপুত্র মুকুট হাতে নামিয়ে বলে, 'এই?'

রাজপুরী থাক, রাজত্ব থাক, শেষে রাজপুত্র বলে, 'চল।'

দূত তা কি উঠতে চায়?

রাজপুত্র তাকে ঘোড়ায় তুলে, ঘোড়া ছুটালে কাঠকন্যার রাজ্যে।

রাজপুত্র না রাজপুত্র। সে রাজ্যের লোকে দেখে বলে, 'কোনও হয়তো সিপাই!'

রাজা বলেন, 'মুকুট দেখি।'

মুকুট দেখে রাজা তার হাত ধরে নিলেন রাজপুরীতে।

রানীরা বলাবলি করেন, 'সৈন্য নাই, কিসের রাজপুত্র?'

জন-পরিজন লস্করে বলে, ‘এ...কেমন রাজপুত্র?’

রাজপুত্র দিনের বেলায় হাঁটা পথে মাঠে বেড়ায়, ঘোড়ার পিঠে পাহাড়ে যায়, আর নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসে।

রাজপুত্র ঢেউয়ের কাছে বাঁশি বাজায়। না কারুর কাছে যায়, না কথা না বার্তা।

রাতের জ্যোৎস্নায়-আঁধারে রাজপুত্র কাঠকন্যার ঘর পাহারা দেয় তরোয়াল খুলে।

জ্বলে চার সারি দীপ।

কাঠকন্যার ঘরে কাঠকন্যা আর ফুলের মালা।

রাজপুত্রের চোখে—ঘুম আছে কি নেই কে জানে?

এক বছর যায়, দু’বছর যায়, তিন বছর যায়, পাঁচ বছর যায়।

যেতে, না ডাকতে ভোরের পাখি, তিন সারি দীপ হাওয়ায় নিভে যায়।

পাহারা ঘুরে রাজপুত্র দেখে, বাতি নেভে।

রাজপুত্র বাতি জ্বালে।

রোজ রোজ হাওয়ায় বাতি নেভে। রোজ বাতি জ্বালে রাজপুত্র। বাতি জ্বেলে, রুপোর কপাট রাজপুত্র আড়াল করে দেয়।

তবু নেভে।

বাতি নেভে আর দু’সারি চন্দন গাছের হাওয়া সরসর, সরসর করে।

নিশ্চুপ থাকে রাজপুত্র।

দুই নতুন তরোয়াল খাপে তুলে রাজপুত্র পাহারায় চলে পরদিন।

চাঁদ ঢলে পড়ে। ভোরের ফুল কুঁড়ি না দিতেই এক সারি বাতি নিভে যায়।

তরোয়াল হেলে।

আ—স্তে পাহারায় থাকে রাজপুত্র।

ঘরে আসতেই। ঘিয়ের পঞ্চদীপ নেভায় কে?

টুকটুকে একখানা হাত!...

‘রাজকন্যা!’

খাপের তরোয়াল ঝন ঝন রাজপুত্রের ডাকে, ঘরে ফুলের মালা দোল দোল, কাঠের পুতুলের গলার মালায় নুয়ে পড়ে ফুরফুরে হাত, চন্দন পাখি গেয়ে উঠে শ্বেত চন্দনের ডালে, রাজপুরীতে শাঁখ, কাঁসর, ঝাঁঝর, বাঁশি বেজে উঠে পোহানো রাতের!

কাঠের পুতুল তুলে ফেলে দিয়ে, রাজপুত্র ডঙ্কায় ঘা দেয়। রাজা উঠে আসেন, রানীরা ছুটে আসেন, রাজপুরী ভেঙেচুরে লোক ছুটে আসে, রাজার আঙিনায়—জীয়ন্ত রাজকন্যা!

আর কিসের কাঠের পুতুল? শিশির ধোয়া ফুলের—চাঁদ জ্বলজ্বল মুখে রাঙা রোদ গলে পড়ে রাজকন্যার!

ডাকে পাখি, ফোটে ফুল, সোনার রঙে আকাশ ভরে, গন্ধ বাতাস থৈ থৈ করে, সৈন্য সামন্তের নিশান ওড়ে!

সমুদ্দুরের নীল পাখি সুর দেয়—

‘রাজকন্যা হাসে কোথায়

নীল কাজল কেশ?

কে গিয়েছে

রাজপুত্র

অরুণ আলোর

দেশ?’

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

একটু মজা

চৌকো আর সংখ্যা

চন্দন-স্যার সেদিন ক্লাসে বললেন, একটা মজার খেলা করা যাক চৌকো ঘর কেটে। তিন সারিতে ৯টা চৌকো ঘর থাকবে। উপরের সারির মাঝখানে ১ বসানো হলো।

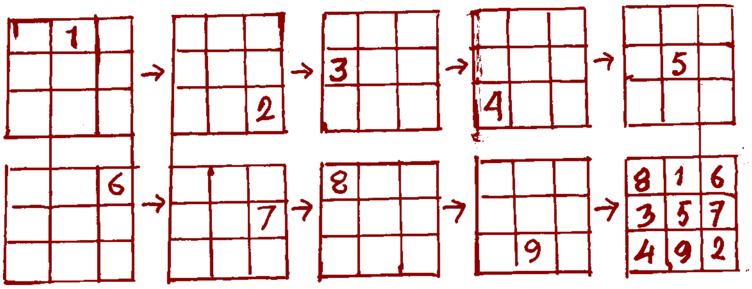

এবার স্যার বললেন, ১ থেকে ৯টা সংখ্যা এমন ভাবে বসাতে হবে যাতে প্রতিটি সারির যোগফল হবে ১৫। খেলা শুরু হয়ে গেল এক একটি সংখ্যা নিয়ে। সময় লাগল ঠিকই। তবে ক্লাস শেষ হওয়ার সময় দেখা গেল— প্রতিটি সারির সংখ্যা যোগ করলে ১৫। ছবি এঁকে দেখা যাক।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. ‘রাজপুত জীবনসন্ধ্যা’ ও ‘মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত’ কে লিখেছেন?

২. স্বাধীন ভারতের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল? তাঁর পিতার পদবি কি ছিল?

৩. প্রথম মহিলা সাহিত্যিক জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান?

৪. প্রথম মহিলা আই পি এস অফিসার?

৫. রাজনৈতিক নারী দিবস কবে?

উত্তর : ১. রমেশচন্দ্র দত্ত। ২. সরোজিনী নাইডু। চট্টোপাধ্যায়। ৩. আশাপূর্ণা দেবী। ৪. কিরণ বেদী। ৫. ৮ মার্চ।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারী ও পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী নয়

শুভশ্রী দাস

এক নারীর অপমানের জন্য মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল, যেখানে নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক মনে করে অর্ধনারীশ্বরের পূজা করা হয়, সেই ভারতে আজ প্রতিদিন বলাৎকার, শ্লীলতাহানি ও নারী নিগ্রহের ঘটনা বেড়ে চলেছে। মহিলাদের প্রতি হওয়া এই অপরাধগুলি নিয়ন্ত্রণ করার নামে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আমদানি করা চলছে। সেখানকার মহিলাদের পরিস্থিতির ইতিহাস এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতা ছাড়াই কিছু তাত্ত্বিক ভারতীয় সমাজকে পশ্চিমি সভ্যতার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

পশ্চিমি সংস্কৃতির তাত্ত্বিকরা মনে করেন, পাশ্চাত্যে নারী ও পুরুষকে সমান মনে করা হয় এবং ভারত পুরুষপ্রধান দেশ হওয়ায় নারীরা পুরুষদের অধীন। তাঁদের এই ভাবনা যে একেবারেই ভ্রান্ত তা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের পাতা ওলটালেই প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষের প্রাচীনগ্রন্থগুলিতে নারীকে পুরুষের সমান শুধু বলা হয়নি, শ্রেষ্ঠরূপে দেখানো হয়েছে। গ্রন্থগুলিতে নারীর নাম পুরুষদের আগে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন— সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, গৌরী-শঙ্কর প্রভৃতি। তখন নারীরা বিয়ের সময় হলে ইচ্ছামতো পাত্র নির্বাচন করতে পারতেন। শ্রীরামচন্দ্র ও অর্জুনের বিবাহ সবারই জানা। ভারতীয় পরম্পরায় নারীদেবতা (দেবী)-র পূজাই প্রমাণ করে নারী সর্বদা পূজনীয়।

পশ্চিমি দেশের সমাজে অধিকারের নামে যে বেলেল্লাপনা চলছে এবং তার ফলে তাদের সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন তাত্ত্বিকদের সে বিষয়ে কোনো খেয়াল নেই। ভারতে জাতীয়স্তরের এক সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল ইউরোপ ও আমেরিকায় ছাত্রছাত্রীদের যৌনাকাঙ্ক্ষার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য নানারকম উপায় খোঁজা চলছে। বৃটেনে স্কুলের ছাত্রদের কন্ডোম এবং ছাত্রীদের গর্ভনিরোধক পিল স্কুল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, যাতে ছাত্রীদের অবাঞ্ছিত গর্ভধারণ থেকে বাঁচানো যায়। ছাত্রছাত্রীদের এই যৌনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য পশ্চিমি দেশগুলির সমাজতত্ত্ববিদরা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুসন্ধিৎসু হয়েছেন। বৃটেন ও আমেরিকার বহু দেশ গত কয়েক বছর ধরে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর গবেষণা করে চলেছেন।

শরীর ও মনে পোশাকের খারাপ প্রভাব দেখে বৃটেনের ৬৩টি স্কুলে গত বছর থেকে মেয়েদের স্কার্টের বদলে ঢিলা সালোয়ার ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করেছে। এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ট্রেভার জোন্সের বক্তব্য, ছাত্রদের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তি কম করার উদ্দেশ্যে পোশাকবিধি চালু করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, চীনের পুলিশ বাসে-ট্রেনে (পাবলিক ট্রান্সপোর্ট) যাতায়াতকারী মহিলাদের মিনি স্কার্টের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ভারতে কিন্তু স্কার্ট ব্যবহারের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। মুম্বইয়ে এক কার ডিলার কোম্পানিতে কর্মরত যে মহিলারা স্কার্ট না পরলে তাদের চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমি ভাবনায়-জারিত ব্যক্তিরা ভুলেই গেছেন পোশাক ভারতীয় সংস্কৃতির এক গৌরবজনক অঙ্গ।

ভারতে টিভি সিরিয়াল ও সিনেমায় ভারতীয় পোশাককে গ্রামীণ মানুষের পোশাক এবং পাশ্চাত্য পোশাককে শিক্ষিত ও সভ্য মানুষের পোশাক হিসেবে দেখানো হচ্ছে। টিভির বিজ্ঞাপন ও ফিল্মে নারীকে ভোগ্যপণ্য রূপে দেখানো হচ্ছে; নারী ও পুরুষকে পরস্পরের পরিপূরক না দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

ভারত সরকার যেখানে ফিল্ম ও টিভি চ্যানেলগুলিতে মদ ও ধূমপানের দৃশ্য আইনত নিষিদ্ধ করেছে, সেখানেও নানাভাবে কামুক দৃশ্য দেখিয়ে সমাজ নষ্ট করার খেলা চলছে। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির জন্য বিজ্ঞাপনে কামুক দৃশ্য ব্যবহার করছে, যার সঙ্গে ওই দ্রব্য বিক্রির কোনো সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞাপনে পুরুষদের ব্যবহৃত দ্রব্যে মেয়েদের ও মেয়েদের ব্যবহৃত দ্রব্যে পুরুষদের দেখানো হচ্ছে।

দেশে মহিলাদের অধিকারের জন্য অনেক সংস্থা কাজ করছে। যখনই কোনো ঘটনা ঘটে সমস্ত সংস্থা একসঙ্গে কঠোর আইন প্রণয়নের দাবি জানাতে থাকে। মহিলাদের পক্ষে আইন অবশ্যই হওয়া চাই। কিন্তু আইন হলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? এই সংস্থাগুলিই বিজ্ঞাপন ও সিনেমায় যেখানে নারীশরীরের প্রদর্শন হয় তার প্রতিবাদ করে না। নারীস্বাধীনতার কাজে নিযুক্ত সংস্থাগুলির উচিত সরকারের কাছে অশ্লীলতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আইনের দাবি জানানো। মহিলাদের অধিকারের নামে সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করার খেলা বন্ধ হওয়া উচিত। আজ আমাদের নারী-অধিকারের নামে পুরুষকে প্রতিদ্বন্দ্বী বানানোর পশ্চিমি ভাবনা বন্ধ করতেই হবে। কেননা ভারতে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক।

অর্থ কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে চলেছে

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

কোনো বড় পরিবর্তনের জন্য চাই বৃহৎভাবনা, নির্ণায়ক নেতৃত্ব আর শুভ পরিস্থিতি-সমূহের সমাপতন। কোনো ভাবেই ভারতীয় সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রকাশিত ঘটনাকে এর থেকে ভালো করে ব্যাখ্যা করা যায় না। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে, নরেন্দ্র মোদী প্রায়শই অভিযোগ করতেন যে কেন্দ্র সরকার রাজ্যের চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের ঠিক উল্টো প্রকল্প চালু করছেন। উদাহরণ স্বরূপ, বৈদ্যুতিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদানের মতো প্রকল্প গুজরাটের কাছে খুব কমই মূল্য ছিল, কেননা ততদিনে গুজরাট তার ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁয়ে ফেলেছে। এই অর্থই যদি রাজ্য অন্য খাতে ব্যবহার করার সুযোগ পেত তবে তা আরোও ফলপ্রসূ উপায়ে ব্যবহার করতো। এরকম দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে নরেন্দ্র মোদী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের মতো অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন। এঁরা প্রায়শই অভিযোগ করে আসছিলেন যে এরকম বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্প আখেরে রাজ্যের রাজস্বের পরিসরকে সীমায়িত করছে, কেননা এইসব প্রকল্পের জন্য রাজ্যকেও তার তহবিল থেকে সমান অর্থ নিতে হয়। এরকমভাবে টাকা দিতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মতো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে খরচ করার মতো সামান্য অর্থই রাজ্যের হাতে পড়ে থাকে। তৎসত্ত্বেও মূলত তিনটি কারণে এই প্রথা একইভাবে বা সামান্য রদবদল করে গত কয়েক দশক ধরে সমানে চলে আসছে। প্রথমত, প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ হলো রাজ্যগুলিকে তাদের অগ্রাধিকার স্থির করতে এবং করের টাকা খরচ করার ব্যাপারে অধিক স্বাধীনতা দেওয়া একথা বলার মতো নেতা, অর্থনীতিবিদ এবং নীতিবিশেষজ্ঞের বড় অভাব। দ্বিতীয়ত, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে করের টাকা ভাগ করে দেবার জন্য অর্থ কমিশন তৈরি করা। প্রথম নীতিতেই অনড় থেকে অর্থ কমিশন রাজ্যকে প্রদেয় করের ভাগকে ৩০ শতাংশ বা তার নীচেই সীমায়িত রাখে। শুধুমাত্র ত্রয়োদশ অর্থকমিশনই এই লক্ষ্যমাত্রাকে বাড়িয়ে ৩২ শতাংশ করেছিল। সর্বশেষ হলো, একাধিক কেন্দ্র সরকার করের বাকি টাকাটা রাজ্যকে কেন্দ্রীয় অথবা কেন্দ্রের অনুমোদিত প্রকল্পের অনুদান হিসেবে রাজ্যকে হস্তান্তর করেছে। গোটা একটা দশক ধরে কর আদায় ৮ শতাংশ হারে বাড়ার কারণে রাজস্ব সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বা কেন্দ্রের অনুমোদিত প্রকল্প বাবদ অর্থের পরিমাণ এবং কর রাজস্বের যে পরিমাণ তারা নিয়ে নেয় তার মাত্রাও নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। এই নীতিতে হঠাৎই পরিবর্তন এসেছে মূলত দু'টি ঘটনা একসঙ্গে ঘটার ফলে। প্রথমত, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একদা একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, যিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অর্থ হলো আইন প্রণয়ন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্যগুলিকে বেশিমাত্রায় ক্ষমতা দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, সভাপতি এবং চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সদস্যদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে।

> “যোজনা কমিশনকে নীতি আয়োগে বদলে ফেলে, প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্র-রাজ্যের সমীকরণে বদল এনে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা সমান সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। এই পরিবর্তন যেন সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এককদম এগিয়ে যাওয়া।”

প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস। উপরন্তু এমন একজন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী যিনি রাজ্যের এবং তাদের নেতৃত্বের ক্ষমতার উপর ভরসা রাখেন, তাঁর দেওয়া সুযোগকে রাজ্যগুলি মর্যাদা দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তারা ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ থেকে কেন্দ্র-রাজ্যের

মধ্যে বণ্টনযোগ্য করের ৪২ শতাংশ পেতে তারা সালিশি করেছে। কর হস্তান্তরের এই ১০ শতাংশ বৃদ্ধি এক কথায় বিপুল এবং অভূতপূর্ব। প্রত্যাশিতভাবেই প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা চতুর্দশ অর্থ কমিশনের এই জোরালো সুপারিশকে মেনে নিয়েছেন। এই পরিবর্তনের তাৎপর্য কি? প্রাথমিকভাবে কর রাজস্বের এই বড় মাপের হস্তান্তরের ফলে দায়িত্ব পালনে রাজ্যের তালিকাভুক্ত যেসব বিষয়ে কেন্দ্র দায়িত্ব নিত, সেসব বিষয়ে এখন থেকে রাজ্যের দায়িত্ব বেড়ে গেল। রাজ্যগুলিকে এখন থেকে তাদের অগ্রাধিকারের তালিকা মেনেই কাজ করতে হবে; 'সর্বঘটে বিল্বপত্র' প্রকল্প অনুসারে নয়। একইভাবে বণ্টনযোগ্য রাজস্বের অপেক্ষাকৃত কম অংশ কেন্দ্রের হাতে থাকায় কেন্দ্রের রাজস্বের পরিসরটি সঙ্কুচিত হবে যাতে কেন্দ্রকে কেন্দ্রীয় এবং কেন্দ্র অনুমোদিত প্রকল্প নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে হবে। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন যে এতে নীতি-আয়োগের ভূমিকা কোথায়? আমি বলব যে, যোজনা কমিশনকে নীতি-আয়োগে বদলে ফেলার আগেই প্রধানমন্ত্রী চতুর্দশ অর্থ কমিশনের ভূমিকা ভেবে রেখেছিলেন। আগের জামানাতে প্রায়শই কেন্দ্রকে 'দাতা' এবং রাজ্যগুলিকে 'গ্রহীতা' বলে ভাবা হত। এতে রাজ্যগুলি নিজেদেরকে অসম অংশীদার বলে মনে করতো। যোজনা কমিশনকে নীতি আয়োগে বদলে ফেলে, প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্র-রাজ্যের এই সমীকরণে বদল এনে উভয়পক্ষের মধ্যে একটা সমান সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। এই পরিবর্তন যেন সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এককদম এগিয়ে যাওয়া। অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশের সময় কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে তৈরি হওয়া নতুন সম্পর্কের একটি সুস্পষ্ট ছবি আমরা দেখতে পাবো। এখনও পর্যন্ত যতটা আমরা জানতে পারছি তাতে একটা বিষয় খুব পরিষ্কার যে আগামী দিনগুলিতে জ্ঞানের পরিসরে নীতি আয়োগকে আরোও বড় ভূমিকা পালন করতে হবে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে রাজ্যগুলিকে আইন প্রণয়ন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বেশি ক্ষমতা দেওয়ার অর্থ হল রাজ্যগুলিকে তাদের নীতি ও কার্যপদ্ধতি নিরূপণে আরোও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। রাজ্যগুলিকে একাজ করতে হলে তাদের তথ্য, বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞ পরামর্শের প্রয়োজন হবে। ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত ক্যাবিনেটের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নীতি আয়োগ এই ধরনের পরিষেবা দেবার কাজ করবে। অনুরূপভাবে আমরা যারা নীতি আয়োগে আছি তাদের আগামী মাসগুলিতে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে যাতে করে আমরা নীতি আয়োগের সামর্থ্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারি এবং যে সমস্ত রাজ্য আমাদের কাছে পরামর্শ ও সহযোগিতা পেতে আসবে তারা যেন নিরাশ না হয়। দেখি কি করা যায়।

(লেখক : নীতি আয়োগের সহ-সভাপতি)

---

২৩ মার্চ, ২০১৫, বিশেষ সংখ্যা

ডা: হেডগেওয়ার ও বিবিধ ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনার প্রতিফলন

সারা দেশ জুড়ে আজ জীবনের সব ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই ভাবনাকে দেশব্যাপী সর্বস্পর্শী করার ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণে আসে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডা: কেশবরাও বলিরামরাও হেডগেওয়ার— সংক্ষেপে ডাক্তারজী। এই বছর তাঁর ১২৫তম জন্মবর্ষ। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর ভাবনা-চিন্তার আজ কতটা প্রতিফলন ঘটেছে— এই বিষয় নিয়েই প্রকাশিত হচ্ছে স্বস্তিকা-র আগামী২৩ মার্চের বিশেষ সংখ্যাটি।

সম্পূর্ণ রঙিন। মূল্য ১৫ টাকা। সত্বর প্রয়োজনীয় কপি বুক করুন।

আহাম্মকের অহঙ্কার : পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

বাংলার শিক্ষা চিত্র নিয়ে লিখতে ইচ্ছা হয় না। অশিক্ষার এমন বলদর্পী গুণ্ডাবাজি এর আগে কখনো পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়নি। বাম আমলে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোত আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএম-এর কার্যালয় থেকে। কথা চালু ছিল উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারটি সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ করতেন সিপিএম-এর দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্পাদক অনিল বিশ্বাস। তবে সেটা হোত অত্যন্ত সন্তর্পণে। রাজ্যের সর্বত্র গণতন্ত্রীকরণের নামে বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছিল পার্টির নিয়ন্ত্রণ। ছাত্র-কর্মচারী-শিক্ষক আর বিভিন্ন স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থাকে কার্যত দখল করেছিলেন তাঁরা। পার্টি সংগঠনের সঙ্গে এইসব গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্পর্ক থাকত। এর নাম গণতান্ত্রিক-কেন্দ্রিকতা (democratic centralism)।

কলেজ শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হোত একই পদ্ধতিতে। সরকারি কলেজগুলিতে কারা পড়াবেন তা স্থির করত পাবলিক সারভিস কমিশন— তাতে বিশেষজ্ঞ থাকতেন পার্টির দাক্ষিণ্য পাওয়া অধ্যাপকরা। এঁদের নিশ্ছিদ্র নজরদারিতে দল-ঘোষিত ছাড়া কোনো অধ্যাপক নির্বাচিত হতে পারতেন না। এঁরা বিশেষজ্ঞ হলেও প্রকৃত আনুগত্যের টিকি বাঁধা থাকত আলিমুদ্দিনে। অধ্যাপকদের বদলির ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হোত সরকারি আধিকারিকদের মারফত। ১৯৮০ সালে তৈরি হলো কলেজ সারভিস কমিশন। বামপন্থী রাজনীতির বজ্রআঁটুনি নেমে এল নতুন করে। এরপর পশ্চিমবঙ্গে অন্য মতের অধ্যাপক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হলো।

উচ্চ শিক্ষার এই শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির বিপক্ষে জনমত তীব্র হয় বিগত বাম শাসনের শেষ দিকে। তবু অবস্থা বদলায়নি। ব্যতিক্রমহীন ভাবে নিয়ন্ত্রণের এইরকম ঘটনা চলতে থাকে। তদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কলেজে সারারাজ্যের আগমার্কা বামপন্থীরা বদলি হয়ে এসেছিলেন, এদের নিয়েই কলেজকে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হলো! বাংলায় গড়ে উঠল আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। স্থানীয় জেলাস্তরের পার্টি নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে চলতে থাকল এইসব উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র। বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে মধ্য মেধার এমন চাষ এর আগে হয়নি।

জ্যোতি বসু যথেষ্ট শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি এ ব্যাপারে মন্ত্রিসভার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উপর এবং দলে অনিল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতেন। এ অবস্থায় জীবনে একদিন স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে না পড়িয়েও একজন পার্টি নেতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছিলেন! এই সব জো হুজুর উপাচার্যদের কেউ কেউ নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন— এমনও হয়েছে।

তবুও, একটু আব্রু ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের পরিচালনার ক্ষেত্রে বামপন্থীরা যাঁদের আনতেন তারা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হয়ত ছিলেন না, তবে একটু চক্ষুলজ্জার অবকাশ অবশ্যই ছিল। একটি মাত্র ব্যতিক্রম মনে পড়ছে। ছাত্র বয়সে কমিউনিস্ট পার্টি করা অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত হলেন পার্টি নিয়ন্ত্রণের বজ্র আঁটুনির ফাঁক গলিয়ে। বামপন্থীরা বুঝলেন সন্তোষবাবু তাদের সব কথা বিনা প্রশ্নে মানবেন না। ফল হলো মারাত্মক। অধ্যাপক ভট্টাচার্যকে চরম লাঞ্ছনা করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মচারীরা। দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারলেন না সন্তোষবাবু। তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে তাঁর 'লাল হাতুড়ির নীচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (Red Hammer over Calcutta University) শীর্ষক চমৎকার গ্রন্থে।

বামপন্থীদের উচ্চ শিক্ষা নীতির আর একটি গুরুতর ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আমলে। কলকাতায় মুসলমানদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়— আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুললেন তাঁরা! বিষয়টি ভয়ঙ্কর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার সময় বাংলার মুসলমানরা এরকম কোনো দাবি তোলেননি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে পদ্মফুলের বিপক্ষে আন্দোলন করেছেন বাংলার মুসলমান নেতারা। কিন্তু মুসলমানদের জন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তাঁরা ভাবেননি। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিতে অবশ্য সংখ্যালঘুদের শিক্ষায় ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বড় বড় কথা বলা আছে। বাস্তবে বিশ্ববিদ্যালয়টি শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়োগ করে চলেছে। এমন কথাও শোনা যায় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিরোধী জঙ্গিদের আনাগোনা কম নেই। কোনো কোনো তেমন উচ্চশিক্ষিত পাণ্ডা ওখানে অধ্যাপনাও করছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

বামপন্থীরা বাংলার শিক্ষা মানচিত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার মধ্যেই সীমিত রাখেননি। আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির একটি ক্যাম্পাস গড়ে তুলেছেন তাঁরা। মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের জমি জবরদখল করে কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্র সরকার ও স্থানীয় সাংসদদের সাহায্যে বাংলায় গড়ে উঠেছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্যাম্পাস। এতদিন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় আসানসোলের উর্দুভাষীদের মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে একটি কেন্দ্র চালাতেন। বামদের ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় পাবার আর কিছু বাকি আছে কি?

বামপন্থীদের শ্বাসরোধকারী গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার পরিস্থিতি থেকে রাজ্যবাসী মুক্তি চাইলেন। পরিবর্তন এল। কিন্তু আমরা

দেখলাম বামেদের চেয়ে বহুগুণিত হয়ে দেখা দিল শিক্ষাক্ষেত্রে বেলাগাম হস্তক্ষেপ। দিকে দিকে অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত গুণ্ডা প্রকৃতির লোকজন নিয়ন্ত্রণের আসনে বসে পড়লেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় স্বচ্ছতা, মান, রীতি নীতির বালাই থাকল না। সর্বত্র উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে লাঠি-সোটা, বল্লম, বোমা, পিস্তল আমদানি করল তৃণমূলের সমাজবিরোধীরা। রায়গঞ্জ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপককে পেটানো, ভাঙড় কলেজে অধ্যাপিকাকে জগ ছুঁড়ে মারা থেকে আরম্ভ করে এতরকম ঘটনা ঘটল যে তার তালিকা তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কোথাও কোনো অধ্যাপককে কলেজের মধ্যে মারা হলো— কারণ তিনি ছাত্র সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে কিছু কথা তাঁর ফেসবুকে পোস্ট করেছেন! সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ সেনেট অধিবেশন চলতে চলতে ছাত্ররা তুমুল গোলমাল করেছেন। কারণ তাদের দেওয়া বেশ কয়েক লক্ষ টাকার হিসাব চাওয়া হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেকার-ল্যাবরেটরি। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের এক অধ্যাপককে ক্লাশ নিতে বাধা দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি বিরোধী দলনেতা ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্রের কন্যা। এই কুৎসিত ঘটনা ধারায় সর্বশেষ সংযোজন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের জঘন্য আন্দোলন। উপাচার্য রতনলাল হাঙ্গুকে সরানোর দাবিতে ঘেরাও অনশন ও চড়াও হয়েছেন তৃণমূল-আশ্রিত শিক্ষাবন্ধুর দল। বন্ধুই বটে! সিকিউরিটি-ইন-চার্জ বসেছিলেন তাঁর আসনে; তাঁকে নির্মমভাবে মারতে থাকলেন বন্ধুদের দুয়েকজন বীরাঙ্গনা! অনেকে বিস্মিত বাক্যহারা। কিন্তু মহিলা বলে এরকম কাজ করতে পারবেন না তা কি হয়! শিক্ষাবন্ধুরা এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নেত্রীর দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেছেন। বাংলার কেউ নিশ্চয় গত সাড়ে তিন বছরে তৃণমূলেশ্বরীর বচন সুধার কথা ভুলে যাননি। কোনো জনপ্রতিনিধি এভাবে এই ভাষায় কথা বলতে পারেন! ভাষা ভঙ্গি আসলে ব্যক্তিগত শিক্ষা-সংস্কার- পরিবেশ থেকে আসে। যে জননেত্রী এভাবে ও ভঙ্গিতে কথা বলেন— তাঁর শিক্ষা ও রুচি সম্পর্কে কারো মনেই কিছু আশা অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। আর শিক্ষামন্ত্রী-মন্ত্রক-দপ্তর থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলেশ্বরী শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর হস্তক্ষেপের কু-দৃষ্টান্ত রেখে চলেছেন।

রায়গঞ্জের ঘটনার পর পঞ্চাশোর্ধ্ব স্থানীয় এক নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় হলেন বাচ্চা ছেলে! ভুল করে একটা কিছু করে ফেলেছে! বস্তুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অধিকারের সীমাটি জানেন বলে মনে হয় না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর তীব্র হলো আন্দোলন। এক শিক্ষার্থী তাঁর উপর ঘটা যৌন লাঞ্ছনার অভিযোগ করলেন। ইউ-জি-সি-র 'বিশাখা নর্ম' মেনে সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন উপাচার্য বিষয়টি নিয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করলেন না। পরে চাপে পড়ে গড়লেন এমন এক তদন্ত-কমিটি যার একজন সদস্য হলেন সরকারের এক মন্ত্রীর কন্যা। উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তী ওই গবেষককে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কমিটিতেই রাখছিলেন। এমনকী তাঁর গবেষণা তত্ত্বাবধায়ককে এনে বসানো হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য হিসাবে! কোনো নীতি নিয়ম না মেনে 'অনিলায়নে'র এমন বেমিশাল উদাহরণ দেখে ছাত্ররা আন্দোলনে নামল।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতিতে অতি বামদের চিরাচরিত প্রাধান্য। অধ্যাপকরা প্রধানত অনিলায়নের ফলে চাকরি পাওয়া, লেভি দেওয়া বামপন্থী! আন্দোলন তীব্র হলো। অনৈতিক আন্দোলন। অন্তত আন্দোলনের পথ— ঘেরাও-অবস্থান-অনশনকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারেন না। কিন্তু বিচিত্র কিছু পরামর্শদাতাদের দ্বারা পরিবৃত পরিতৃপ্ত উপাচার্য রাত্রে পুলিশ ডাকলেন! যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। মাননীয় উপাচার্য গোপালচন্দ্র সেন নকশাল আমলে আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করেন--- কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ ঢোকেনি। রাত্রির আলোকস্তম্ভ হঠাৎ নিভে গেল। প্রবল অত্যাচার হলো— তার কোনো প্রমাণ না থাকার ব্যবস্থা হলো। এরপর আমাদের পক্ষে উপাচার্যকে সরে যাবার দাবি সমর্থন করা ছাড়া উপায় ছিল না। সারা রাজ্যের ছাত্ররা বৃষ্টিস্নাত ঘোর দুর্যোগের মধ্যে এক বিশাল মিছিল করল— 'হোক কলরব'। এরপর উপাচার্যের পদত্যাগ ছাড়া সমাধান সম্ভব ছিল না।

কিন্তু কি করলেন মুখ্যমন্ত্রী? তিনি অনশনরত ছাত্রদের মাঝখানে আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করলেন--- উপাচার্য পদত্যাগ করছেন! শিক্ষামন্ত্রীকে বললেন এস. এম. এস. বার্তা পড়ে শোনাতে। সংশ্লিষ্ট সকলেই অবাক। বিশ্ববিদ্যালয় তো স্বশাসিত সংস্থা। তার উপাচার্য তো মুখ্যমন্ত্রীর তালুকদার নন! এভাবে কোনো উপাচার্যকে অপসারণ করা যায় না। যে কাজ শিক্ষা দপ্তরের, শিক্ষা দপ্তরের বড়জোর শিক্ষামন্ত্রীর--- বস্তুত উপাচার্য নিযুক্ত হন মাননীয় আচার্য রাজ্যপাল মহোদয়ের দ্বারা— সুতরাং যে কাজ প্রকৃতপক্ষে আচার্য রাজ্যপালের, সেই কাজ মুখ্যমন্ত্রী করলেন! তিনি নিজের পদমর্যাদার হানি ঘটালেন আর অস্বীকার করলেন সমস্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানিকতার বিধি বিধান, রীতি নীতি! একে অজ্ঞতা বললে সবটুকু বলা হয় না। এ হলো আহাম্মকের আস্ফালন।

বাংলার সর্বত্র শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা তীব্র। মেধাবী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অন্য রাজ্যগুলি এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলা পিছন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি বাস কন্ডাকটাররা যেভাবে যাত্রীদের বলেন— পিছন দিকে এগিয়ে যান। অশিক্ষিত অহঙ্কারী আহাম্মকের অধীনে শিক্ষাক্ষেত্রে এর চেয়ে ভালো কিছু ঘটা সম্ভব নয়। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

বিশেষ প্রবন্ধ

রাজনৈতিক দলের এজেন্ট হয়ে উঠেছে ছাত্র ইউনিয়নগুলি

বরুণ দাস

ছাত্র রাজনীতি আজ কোন্ পথে? ছাত্রদের কি রাজনীতি করা উচিত? পুরনো বিতর্কটা আবার উঠেছিল এস এফ আই নেতা সুদীপ্ত গুপ্তের অকালমৃত্যুর পর। সম্প্রতি স্কুল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতির নামে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রফ্রন্টের নেতৃত্বস্থানীয়দের নির্বিকল্প গুণ্ডামির জেরে ফের বিতর্কটা উঠে এসেছে। অথচ শাসকদলের সুপ্রিমো ছাত্র সংসদের লাগাতার গুণ্ডামিকে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, সাজানো কিংবা ছোট ঘটনা বলে লঘু করার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে কি বলছেন বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ থেকে রাজনীতিবিদ, বিচারপতি থেকে সাধারণ গৃহবধূ, তরুণ গবেষক থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা? এই প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয়েছে এঁদের মতামত।

'ছাত্ররা অবশ্যই রাজনীতি করবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ছাত্র রাজনীতিকে গ্রাস করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। ছাত্র ইউনিয়নগুলি রাজনৈতিক দলের এজেন্টে পরিণত হয়েছে।' ঠিক এভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'যাঁরা বলছেন ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত নয়, আমি তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করি না।' অমলবাবুর স্পষ্ট সংযোজন, 'সমাজের সর্বস্তর থেকেই এই দাবিটা তোলার সময় এসেছে— ছাত্র রাজনীতি থেকে রাজনৈতিক দলের ছোঁয়াচ হঠাও। তাহলেই একমাত্র শিক্ষাঙ্গনকে হিংসামুক্ত করা সম্ভব।' তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের মতো আর কোনো রাজ্যে ছাত্র রাজনীতিকে দলতন্ত্র গ্রাস করেনি। এ রাজ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এস এফ আই-এর জয় মানে সিপিএমের জয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জিতল মানে তৃণমূল কংগ্রেস জিতলো।' তাঁর স্পষ্ট কথা, 'এইসব ছাত্র সংগঠনের কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। তারা কী বলবে, কোন্ পথে চলবে তা ঠিক করে দেয় রাজনীতির দাদা-দিদিরা।'

ছাত্রদের রাজনীতি করার ইস্যু কি হবে— এ প্রশ্নের উত্তরে বর্ষীয়ান এই শিক্ষাবিদ বলেন, 'শিক্ষার বাণিজ্যিকরণ, সিলেবাসের পরিবর্তন, পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নের মতো দাবি নিয়ে পথে নামুক ছাত্র-ছাত্রীরা। সাক্ষরতার প্রসার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, মাদক বিরোধিতার মতো বহু সামাজিক বিষয় আছে যা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরই রাজনীতি করা উচিত।' তিনি বলেন, 'আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকার সময় কলেজকে পরিচ্ছন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। নকশালপন্থী ছাত্র-ছাত্রীরা বলতে শুরু করেছিল— সমাজ যখন এতটা অপরিচ্ছন্ন, তখন কলেজ পরিচ্ছন্ন করার অর্থ কি?'

অমলবাবুর আক্ষেপ, 'সাতের দশকের আগে পর্যন্ত ছাত্ররাজনীতি আজকের মতো দলীয় রাজনীতির হাতে বন্দি ছিল না। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করেছিলেন। প্রিয়- সুব্রত জুটি সেই উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছিল। সেই জুটির মোকাবিলায় বামপন্থীরাও একই পথ নিয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরও পরিস্থিতি পাল্টাল না। যেমন বদলায়নি বামপন্থীরা ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার পরও।'

প্রবীণ শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যালের সরাসরি বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলিতে ছাত্ররাজনীতির নামে যা চলছে তাতে আমি মনে করি, আগামী বেশ কয়েক বছর ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা দরকার। লিংডো কমিশন বলেছে, ছাত্র সংগঠনগুলিকে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ার বাইরে রাখতে হবে। আমার মনে হচ্ছে সেটা করেও এ রাজ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের দলীয় রাজনীতির কবলমুক্ত করা যাবে না। তাদের রাজনীতি থেকেই দূরে রাখতে হবে।'

ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার উপদেশ হাস্যকর ভণ্ডামি বলে মনে করেন সত্তরের অবিসংবাদী ছাত্রনেতা অসীম চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'শিক্ষায়তনে হিংসার দায় ছাত্র নির্বাচন বা ছাত্র রাজনীতি নয়। এখন রাজ্যে যে এলাকা দখলের রাজনীতি চলছে, তার অনিবার্য অংশ হিসেবে অ-ছাত্র বহিরাগতদের শিক্ষায়তনে হামলারই ফলশ্রুতি। প্রয়োজন হলো, বহিরাগত গুণ্ডাদের শিক্ষায়তনে হামলা বন্ধ করা। তার পরিবর্তে ছাত্রদের ওপর ছাত্র রাজনীতির ওপর দায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' এ যেন, 'থ্রোয়িং অ্যাওয়ে দ্য বেবি অ্যালং উইথ দ্য বাথওয়াটার। জন্ম জলের সঙ্গে সদ্যোজাত শিশুটিকেই ছুঁড়ে ফেলার ভ্রান্তচিন্তা।'

ছাত্ররাজনীতি নিয়ে কি বলছেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়? ভগবতীপ্রসাদবাবু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, 'ছাত্রদের মূল এবং একমাত্র কাজ হলো অধ্যয়ন। তার সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। রাজনীতি করার জন্য দেশের নেতারা তো রয়েইছেন। রাজনীতি করতে গিয়ে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।' প্রাক্তন বিচারপতির স্পষ্ট উচ্চারণ কঠোর হাতে ছাত্রদের মধ্যে রাজনীতি বন্ধ করা উচিত বলে মনে করি।

ছাত্র-ছাত্রীদের রাজনীতি করা নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রীতি রায়

বলেন, 'বোফর্স থেকে টুজি কেলেঙ্কারি, সব কিছুতেই তো রাজনৈতিক দল ও নেতা-নেত্রীদের নাম জড়িয়ে গেছে। তা বলে কি ওইসব নেতা-নেত্রী রাজনীতি করা ছেড়ে দিয়েছেন? নাকি আরাবুল বা মজিদ মাস্টারের মতো মানুষেরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হওয়ার পর বিধানসভা-পুরসভাগুলি উঠে গেছে? তাহলে কিছু দুষ্কৃতীর জন্য কেন আমাদের রাজনীতি করা বন্ধ করে দিতে হবে? সর্বত্রই ক্ষতিকারক মানুষ আছে। তাদের এড়িয়েই আমাদের সুস্থ রাজনীতি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

বোস ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর শিবাজী রাহা-র সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, 'ছাত্র রাজনীতি এবং ছাত্রদের সমাজ সচেতনতা—এই দু'য়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এই চেতনার জন্যই ছাত্ররা সমাজের বিভিন্ন ঝোঁক নিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবে। কিন্তু এটা একেবারেই ছাত্রদের ওপরে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তা নিয়ন্ত্রণ করতে যেভাবে রাজনৈতিক দলগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমি তার বিপক্ষে।'

প্রেসিডেন্সির পড়ুয়া সৌম্যদীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সংসদে মন্ত্রীরা, কারখানায় শ্রমিকরা রাজনীতি করতে পারলে কেন ক্যাম্পাসে ছাত্ররা রাজনীতি করবে না? কেন সমাজের ভালোমন্দ নিয়ে ছাত্ররা কথা বলতে পারবে না? রাজনীতির বিষয় এই সমাজেরই বিষয়। ছাত্ররা কি তার বাইরে?'

এই প্রতিবেদনের ইতি টানি হেরম্বচন্দ্র কলেজের বাংলার বিভাগীয় প্রধান নবীনতা চক্রবর্তীর কথা দিয়ে। তাঁর কথায়, 'এ রাজ্যে যেভাবে ছাত্র ইউনিয়ন কাজ করছে তা নিয়ে আপনার জিজ্ঞাসা উঠে আসা স্বাভাবিক। —কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা? সচেতন নাগরিক হিসেবে এর অপ্রয়োজনীয়তার কথা বলি কি করে? ছাত্র সংসদই তো পারে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধে-অসুবিধের দিকে লক্ষ্য রাখতে। তারাই তো দেশের কথা ভাবার মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে এই সংসদের হাত ধরে।' এরপরই তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, কিন্তু বাস্তব কি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করছে? নিজের প্রশ্নের উত্তরও দেন নবীনতা, 'কলেজের ছাত্র সংসদগুলি কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করতে বাধ্য হয়। ছাত্র সংসদ কলেজের কোনো প্রকৃত ছাত্র-সমস্যা নিয়ে নিরপেক্ষ কথা বলে না।'

তিনি আরও বলেন, 'একজন ছাত্র কলেজে পড়তে এসে ১৫০ বা ১৮০ জনের হাটে বসে যে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে না, তাদের যে পড়ার প্রকৃত পরিবেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকার দিতে বাধ্য, সে নিয়ে কোনো আন্দোলন হয় না। ছাত্ররা রাজনীতি সচেতন না হলে দেশ গড়ার সচেতন নাগরিক পাওয়া যাবে না।'

সুতরাং রাজ্যের সাম্প্রতিক ছাত্র রাজনীতি নিয়ে যাঁরা বিরক্ত এবং যাঁরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউনিয়ন-রাজ বন্ধের পক্ষে ওকালতি করছেন, তাঁরাও ছাত্র আন্দোলনকে অস্বীকার করতে পারেন কি? অন্তত ভারত ও বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের ছাত্র আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে? ■

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES
"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12
71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657
Visit Our Website :
www.calcuttawaterproofing.com

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

গরিব ছাত্রদের সার্বিক বিকাশে সোন্দরা গুরুকুলম্

অন্য রকম

শুভেন্দু দাস ॥ অবহেলিত মানুষের দুঃখ, বঞ্চনা যখন চরমসীমায় পৌঁছে যায়, তখন তা দেখে তাদের এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্য কেউ কেউ এগিয়ে আসেন। তাদের নতুন জীবনের দিশা দেখিয়ে সামাজিক, আর্থিক ও আর্থিক উন্নতির পথে নিয়ে যায় এবং দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের কাছে। এই রকমই একজন সংবেদশীল মনের মানুষ হলেন মহারাষ্ট্রের বীড় জেলার সুদাম ভোভে।

মহারাষ্ট্রের মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলের একটি অনুন্নত জেলা হল বীড়। যদিও মহারাষ্ট্রকে ভারতের একটি আধুনিক ও উন্নত রাজ্য বলেই গণ্য করা হয়, তবুও মারাঠাওয়ারা অঞ্চল আজও অবহেলিত।

তার মধ্যে জেলা হিসাবে বীড় আরও পিছিয়ে আছে এখানকার লোকের আয়ের একমাত্র উৎস হলো খেতমজুরি এবং আখের জমিতে দিনমজুরের কাজ করা। যখন কাজ থাকে না তখন এদের খাদ্যের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে হয়। তাই এই জেলায় মানুষ স্বাস্থ্য শিক্ষা সবদিক থেকেই বঞ্চিত। রোজগারের জন্য ঘুরে বেড়ানোর কারণে গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনাও হয় না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক নানাজী দেশমুখ এই বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষদের পাশে এসে দাঁড়ান এবং তাদের সবরকম উন্নতির জন্য একটি প্রকল্পের সূচনা করেন। এই সময় নানাজী দেশমুখের সংস্পর্শে আসেন এই বীড় জেলারই যুবক সুদাম ভোভে। সুদাম নানাজীর পরিকল্পনায় উৎসাহী হন এবং এই অবহেলিত মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন। ১৯৮৬ সালে নানাজী ও সুদাম ভোভের উদ্যোগে তৈরি হয় ‘সোন্দরা গুরুকুলম্’। ভোমরী গ্রামের কাছে তৈরি এই আবাসিক বিদ্যালয়ে সেই সব ছেলেকে এনে রাখা হয় যারা বিভিন্ন কারণে পড়াশোনা করার সুযোগ পায় না। এই স্কুলের লক্ষ্যই হলো ছাত্রদের সার্বিক বিকাশ এবং তার মাধ্যমে তাদের গ্রামের সার্বিক উন্নতি। স্কুলের শিক্ষকরাও এই স্কুলেই থাকেন ছাত্রদের সঙ্গে এবং ছাত্রদের উন্নতিতে সবরকম সাহায্য করেন। একেবারে পারিবারিক পরিবেশে এখানে ছাত্রদের নীতিশিক্ষা দেওয়া হয় এবং আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও পরিচিত করানো হয়।

ছবির মতো মনোরম ভৌগোলিক পরিবেশে অবস্থিত এই গুরুকুলম্ নিজস্ব এক শিক্ষার ধারা তৈরি করেছে, যা অনেকে ছাত্রকেই শিক্ষার আলোকে আলোকিত করেছে। কিন্তু এখানে শুধুই যে প্রথাগত শিক্ষা দেওয়া হয় তাই নয়, তার বাইরে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যও সমান জোর দেওয়া হয়। গুরুকুলম্ পড়াশোনা করানোর পাশাপাশি গ্রামের উন্নতির জন্য কর্মহীন যুবকদের বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ছোট ব্যবসা শুরুর জন্য অর্থসাহায্যও করা হয়ে থাকে। গ্রামের লোকেদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার কাজও এই স্কুল করে থাকে। ২০ একর জায়গা জুড়ে তৈরি এই গুরুকুলমে একটি গো-শালা আছে সেখানে ২০টি গাভী আছে। এছাড়াও সুইমিং পুল ও কমপিউটার ল্যাব আছে। ১৯৮৬ সালে শুরু হওয়া এই গুরুকুলম্ কোনোরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই চলছে। সারাদেশ থেকে অনেক মানুষ এবং সংস্থা এই গুরুকুলম্ দেখার জন্য আসেন। এখান থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে অনেকেই তাঁদের নিজেদের জায়গায় প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন। সমাজের কাজের জন্য তৈরি এই সোন্দরা গুরুকুলম্ সমাজের সহযোগিতায় নিরলসভাবে সমাজের কাজ করে চলেছেন এবং কাজের প্রেরণা দিয়ে চলেছেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

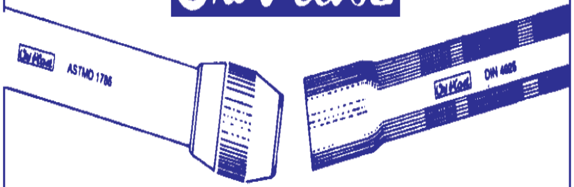

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ঈশ্বরকে কখনও কখনও মধুর হতে মধুরতম, আবার ভীষণ হতে ভীষণতররূপে সম্বোধন করা হয়। ভারতের ঋষিগণ বলেন, একজন অতিদয়াল ভগবানের কল্পনা শিশুসুলভ স্বপ্ন মাত্র। কারণ যিনি 'দয়া' সৃষ্টি করেছেন, তিনিই 'ভীষণের' স্রষ্টা। যা 'ভাল' বলে প্রকাশিত, 'মন্দ' তারই আর একটি রূপ মাত্র।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

রেলের স্বাস্থ্য-ফেরানোর বাজেট

দিব্যজ্যোতি চৌধুরী।। যে পরিষেবাটি ভারতের আর্থিক উন্নতি, কর্মসংস্থান ও পরিবহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা বলে ভাবা হয়, খোদ তার অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়। গত সরকারের এক রেলমন্ত্রীর কথায়, ভারতীয় রেল আই সি সি ইউ-এ ঢুকে গেছে, কোমায় চলে গেছে। তাই এবারের রেলবাজেটের সবচেয়ে বড় দাবি ছিল, রেলের স্বাস্থ্য ফেরানো। সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে যে, রেলের যাত্রীসংখ্যা আগের তুলনায় কমেছে, কমেছে আয়ও। দূরপাল্লার যাত্রীরা অনেক বেশি খরচ করেও বিমানযাত্রাকে বেশি স্বাচ্ছন্দের ও সুরক্ষিত মনে করছেন। দীর্ঘদিন ধরে রেল পরিষেবাকে আঞ্চলিক রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করার কারণে অবহেলিত হয়েছে যাত্রীপরিষেবা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়গুলি। একদিকে রেলকর্মীদের বেতন, পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ- সুবিধা দিতে বিপুল খরচের বোঝা রেলকে বইতে হচ্ছে, অন্যদিকে রেলের বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হার ব্যয়ের একচতুর্থাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এযাবৎ রাজনীতির স্বার্থে নিতান্ত অবিবেচকের মতো নিত্যনতুন প্রকল্প ঘোষণার প্রতিযোগিতা চলেছে যার ফলে পরিষেবার আধুনিকিকরণের মতো জরুরি বিষয়ে চাহিদার ছিটেফোঁটা মাত্র (৬ শতাংশেরও কম) বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ করা সম্ভব হয়েছে। তাই 'সংস্কারের সরকার' যে পুরনো পথে হাঁটবেন না, সেটা প্রত্যাশিত ছিল। বাজেটে তাঁর নিজের রাজ্যের জন্য বিশেষ কী প্রকল্প ঘোষণা করছেন, এমন এক প্রশ্নের জবাবে রেলমন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি মহারাষ্ট্রের নন, রাষ্ট্রের রেলমন্ত্রী। যে সমস্ত অপরিহার্য বিষয় এবারের রেলবাজেটকে প্রভাবিত করেছে সেগুলি হলো—

১. সর্বস্তরে অপচয় রোধ করে ব্যয়সংকোচ করা।

২. রেল পরিষেবার যে প্রাথমিক ভূমিকা যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের, তার উপর জোর দেওয়া।

বাজেট পেশ করছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু।

৩. রেলের আধুনিককরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রবর্তনের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জন করা।

৪. রেলযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষা বাড়িয়ে যাত্রীদেরও আস্থা ফিরিয়ে আনা।

৫. অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রবর্তন করে রেলকে সময়ানুবর্তী করার মাধ্যমে ব্যয় কমানো এবং পরোক্ষে আয় বাড়ানো।

৬. রেল নিয়ে পক্ষপাতিত্ব এবং রাজনীতির অবসান ঘটানো।

বিভিন্ন স্টেশনে সৌরশক্তির মতো অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহার এবং শক্তিসম্পদ হিসেব করে ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির অপচয় রোধে পরিকল্পনা রেলের স্বাস্থ্য ফেরাতে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনে যাত্রীবহন ক্ষমতা বাড়ানো, স্যাটেলাইট রেল টার্মিনালের মাধ্যমে শহরতলি ও দূরপাল্লার যাত্রীদের একসঙ্গে পরিষেবা দেওয়া, দ্রুতগতির ট্রেনগুলিকে দ্রুততর করা, ওয়ার্কশপগুলির সংস্কার করে একসঙ্গে রেলের বহুবিধ প্রয়োজন মেটানো ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষতা বাড়িয়ে পরোক্ষে আয় বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। তাতে কর্মসংস্থানও বাড়বে। যাত্রীদের পছন্দের খাবারের বন্দোবস্ত করা, এস এম এসে সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া, আগাম বুকিং-য়ের সময়সীমা বাড়ানো, স্বয়ংক্রিয় টিকিট মেশিন চালু করা, এরকম আরোও অনেক পরিষেবা দিয়ে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে মনোযোগী হয়েছে এ বাজেট। শুধু তাই নয়, দূরপাল্লার সমস্ত শ্রেণীর যাত্রীর শোবার ব্যবস্থা করে, রেলকক্ষে প্রবীণ নাগরিক, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এবং দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল ব্যবস্থার মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ করে যেমন যাত্রীদের প্রতি রেলের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনে সদিচ্ছা দেখিয়েছে, তেমনি পাশাপাশি ট্রেনে বিনোদন ব্যবস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে ওয়াইফাই পরিষেবা দিয়ে রেলযাত্রাকে আরোও আকর্ষক করতে চেয়েছে।

চলন্ত ট্রেনযাত্রীদের জন্য 'টোলফ্রি' হেল্পলাইন, মহিলা কামরাতে সুরক্ষা বাড়াতে প্রযুক্তির ব্যবহার, দুর্ঘটনা রুখতে প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রশিংয়ে স্বয়ংক্রিয় সতর্কতার সংকেত দেওয়া, যথাসম্ভব লেভেল ক্রশিং তুলে দিয়ে উড়ালপুল তৈরি করা এবং অনুরূপ বহুব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে রেলযাত্রাকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ট্রেনে জৈব এবং ভ্যাকুয়াম শৌচাগার চালুর মতো আরোও অনেক স্বচ্ছতার পরিকল্পনা করে উন্নত দেশের মতো বেসরকারি সহযোগিতায় রেলের উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছে এ বাজেট।

সরাসরি যাত্রীভাড়া না বাড়িয়েও যে বিকল্প উপায়ে আয় বাড়িয়ে রেলের সংস্কার করে তাকে যুগোপযোগী করে তোলা যায়, সে বিষয়ে এ বাজেট সুস্পষ্ট দিশা দেখাতে পেরেছে।

এক কথায়, রেলবাজেটের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে, তাকে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করে এই প্রথম সরকার সমাজের প্রায় সর্বস্তরের মানুষের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে।

সমাবেশ সমাচার

ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে কবাডি প্রতিযোগিতা

গত ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা জেলা ক্রীড়া ভারতীর উদ্যোগে শ্যামবাজার শ্যাম পার্কে এক ইন্টার স্কুল কবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সকাল ১০-৩০ মিনিটে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতজয়ী পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস ক্রীড়া ভারতীর পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন এবং কবাডিতে অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বজিৎ পালিত নারিকেল ফাটিয়ে কবাডি খেলা শুরু করান।

কবাডি প্রতিযোগিতায় উত্তর ও মধ্য কলকাতার বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল মিলিয়ে মোট ১৪টি স্কুল অংশগ্রহণ করে। অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বজিৎ পালিত, এভারেস্ট পর্বতজয়ী পর্বতারোহী দেবাশিস বিশ্বাস ছাড়াও কবাডি প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন কবাডিতে বর্তমান ভারতীয় কবাডি টিমের খেলোয়াড় শেখ রাজা ও ফারুক আহমেদ, কলকাতা সিটি কেবিলের ডিরেক্টর তিনকড়ি দত্ত, বড়বাজার লায়নস্ ক্লাবের ডিস্ট্রিক্ট গভর্নর পবন বেরী, ক্রীড়া ভারতীর ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক মধুময় নাথ, ক্রীড়া ভারতীর প্রাদেশিক সম্পাদক তপন গঙ্গোপাধ্যায়, ক্রীড়া ভারতীর প্রাদেশিক সভাপতি তপনমোহন চক্রবর্তী, ক্রীড়া ভারতীয় কলকাতা জেলা সংযোজক বিভাস মজুমদার এবং বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ।

এদিনের কবাডি খেলায় প্রথমস্থান অধিকার করে বড়বাজারের মাহেশ্বরী বিদ্যালয় এবং দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেন মুরারীপুকুরের আদর্শ বিদ্যাপীঠ। প্রতিযোগিতায় সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন মাহেশ্বরী স্কুলের অধিনায়ক কুশল ব্যাস। সারাদিনের এই কবাডি প্রতিযোগিতা সঞ্চালন করেন ক্রীড়া ভারতীর মধ্য কলকাতা সংযোজক প্রবীর পাল।

কবাডি খেলা দেখার জন্য স্থানীয় মানুষ ও স্কুলের ছাত্রদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় অভিনব প্রদর্শনী

সম্প্রতি গগণেন্দ্র প্রদর্শশালায় ৪ দিনের এক অভিনব প্রদর্শনী হয়ে গেল থিয়েটারের নানা বিষয় সাজিয়ে। নাটকের নাম বা লোগো, ব্রেশিওর, পোস্টার, স্টিলফটো, বই আরও নাট্যসম্পর্কিত নানা উপকরণ নিয়ে। নাটকের প্রথম অভিনয়ের টিকিট, পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপনের নমুনা— সব স্থান পেয়েছে এই অভিনব প্রদর্শনীতে। গত বেশ কয়েকবছর বাংলা নববর্ষে সংস্কার ভারতী বিভিন্ন থিম নিয়ে সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশ করে আসছে।

বাংলার যাত্রাপালা, আধুনিক বাংলা নাটক ও শতবর্ষে ডাকঘর বিষয়ক তিনটি রঙীন দেওয়ালপঞ্জীও এখানে দেখা গেল। আয়োজক নাট্যগবেষক কমল সাহার নাট্যকোষ পরিষদ।

১৯৮০ থেকে ২০১৫ এই ৩৫ বছরের মধ্যে কমল সাহা বাংলা থিয়েটারের অনেক তথ্য সাল-তারিখ-নাম কমপিউটার বন্দী করেছেন। যার অনেকটাই নাট্যজনের মধ্যে মেলে ধরতে ইতিমধ্যেই ছোটো ছোটো পুস্তিকা, পত্রিকা, বই প্রকাশ করে আসছেন নিয়মিত। তবে এইবার বৃহৎ পরিকল্পনায় বৃহৎ এক কোষগ্রন্থ প্রকাশিত হলো বাংলা নাট্যকোষ পরিষদের উদ্যোগে এবং কমল সাহার সম্পাদনায়। গবেষণাকাল ১৭৯৫ থেকে ২০১৪। বর্ণনাক্রমিক গ্রন্থনা তিন খণ্ডে চারটি অধ্যায়— নাট্যজন, প্রকাশিত নাটক ও প্রযোজিত নাট্যের বিবরণ, নাট্যদল এবং বিবিধ বিষয়। প্রতি খণ্ডে প্রচুর ছবি ও প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি এই গ্রন্থপ্রকাশ ও প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ভারতীয় থিয়েটারের আর এক সংরক্ষক ও গবেষক নাট্যশোধ সংস্থানের প্রধান ড. প্রতিভা অগ্রবাল। বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা সেন, নাট্যকার-নির্দেশক বিকাশ ভট্টাচার্য। প্রদর্শনীর তিনদিন প্রবীণ বিশিষ্ট নাট্যজন থেকে শুরু করে সাধারণ নাট্যকর্মী, ছাত্রছাত্রী, সাধারণ দর্শক অনুরাগীর ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই নাট্যকোষ প্রতিখণ্ড ২০০০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : ১৯২এ/১, পিকনিক গার্ডেন রোড। কলকাতা-৩৯ (৯২৩১৫৭২৩৪৩)।

সিউড়ীতে সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে বীরভূম জেলায় সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিদ্যামন্দিরের ভবন নির্মাণের শুভ সূচনা করেন বিদ্যাভারতীর অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক প্রকাশ চন্দ্রজী।

অনুষ্ঠানে বহু অভিভাবক, অভিভাবিকা, বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের সভাপতি গোপাল হালদার ও সংগঠন সম্পাদক অলোক চট্টোপাধ্যায়, জেলার শিশুমন্দির সমিতির সভাপতি শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়, শিশুমন্দিরের সম্পাদক অচিন্ত্য দত্ত ও সহ-সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিশুমন্দিরের প্রধান আচার্য জীতেন চট্টোপাধ্যায়।

উত্তরপূর্ব ভারতে প্রথম যুব-রেপার্টরি

সম্প্রতি শিলং-এ শুরু হলো প্রথম রেপার্টরি থিয়েটার। এই রেপার্টরি উদ্বোধন করা হলো যাতে শিলং-এর শুধু নয়, সারা উত্তর- পূর্ব ভারতের যুবকদের সামনে নতুন কাজের আরও একটা উপায় উন্মোচিত হতে পারে। নাট্যচর্চাকেই যারা ধ্যানজ্ঞান করেছেন তাঁরাও যাতে কাজের সন্ধান পান। শিলং রেপার্টরি থিয়েটার আদতে 'এশিয়ান কনফ্লুয়েন্স' সংস্থা ও তথ্য দপ্তরের মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। এর প্রথম ডিরেক্টর নির্বাচিত হন তরুণ নির্দেশক তরুণ সিংনেগি। এই যুবক গত ৫/৬ বছর ধরে ওঁর 'নর্থ ইস্ট ফরওয়ার্ড' দলের মাধ্যমে যুবকদের থিয়েটারে আগ্রহী করে তুলছেন। জেলের মধ্যে, বস্তিতে, অন্ধকার জগতে চলে যাওয়া যুবকদের টেনে এনেছেন থিয়েটারে। ''থিয়েটার যদি না চারপাশকে বদলাতে পারে তবে কেবল মনোরঞ্জনের জন্যে হলে তার মাহাত্ম্য কি? মানুষ বাঁচতে-বাঁচতেই তার পাশের মানুষকে বাঁচাবে এটাই থিয়েটারের মাহাত্ম্য।'' বললেন নেগি।

আপাতত ১০০ জন যুবককে নেওয়া হবে এই রেপার্টরিতে। মেঘালয়ে আরও একটা রেপার্টরি চালু হবে অদূর ভবিষ্যতে। শিলং আই সি সি আর-এর আঞ্চলিক অধিকর্তা এন. মুনিষ সিং জানান, ''মেঘালয়ের নাট্য সংস্কৃতিকে বহুগুণে বাড়াবে এই রেপার্টরি। আমরা চাই এন.এস.ডি (ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা)-র সহায়তায় এর অঙ্গ হিসেবে একটি বিদ্যালয় চালু হোক।''

শোক সংবাদ

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হলেন মালদহের প্রয়াত হরিপ্রসন্ন মিশ্রের সহধর্মিণী প্রতিভা মিশ্র। উল্লেখ্য, হরিপ্রসন্ন মিশ্রের মৃত্যুর পর তিনি জলপাইগুড়ি শহরের শিল্পসমিতি পাড়ায় থাকতেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ব্যক্তিগত জীবনে মালদহ বার্লো বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সেবাকাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

মালদহের চাঁচোলে সেবা ভারতীর অর্শ চিকিৎসা শিবির

গত ১ মার্চ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলা সেবা ভারতীর উদ্যোগে এক অর্শ চিকিৎসা শিবির হয়। অর্শ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি সি সাহা ১০০ জন রোগীর চিকিৎসা করেন।

ডাঃ মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী দাতব্য অছি সংস্থার ১১তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

গত ২২ ফেব্রুয়ারি ডাঃ মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী দাতব্য অছি সংস্থার ১১তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয় সল্টলেকের ডাঃ প্রণবেশ্বর চক্রবর্তীর উদ্যান বাটিতে। অনুষ্ঠানে ৭৫ জন ছাত্রছাত্রীকে মোট ৬৫ হাজার, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চৈতন্যমঠ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, শ্রীকুঞ্জবিহারী গৌড়ীয় মঠকে ৬৫ হাজার এবং মথুরার রাধাকুণ্ড সংস্থাকে ১ লক্ষ টাকা মোট ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ৭৫ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীর হাতে চেক তুলে দেন অছি কর্তৃপক্ষ। মূলত গ্রামবাংলার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যাতে অর্থের অভাবে পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত না হয় তারই জন্য এই আর্থিক অনুদান কর্মসূচি প্রতি বছর গ্রহণ করে থাকেন অছির কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী শিলিগুড়ি হাইস্কুল থেকে ১৯৮৫ সালে প্রথম বিভাগে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে দার্জিলিং জেলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ওই বৎসরই নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে ১৯৯০ সালে এম বি বি এস পাশ করে ইনটার্নশিপ সম্পন্ন করেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগের চিকিৎসক হিসাবে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকে এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তিন বছর কর্মরত থেকে স্থানীয় দরিদ্র জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। আপামর জনসাধারণ তার সেবায় সন্তুষ্ট ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় মাত্র ৩১ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর পিতা কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক ডাঃ প্রণবেশ্বর চক্রবর্তী 'ডাঃ মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী দাতব্য অছি' প্রতিষ্ঠা করে দুঃস্থ মানুষদের সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অছির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ প্রণবেশ্বর চক্রবর্তী, অছির সম্পাদক মালদা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ নিশীথ কুমার পাল, প্রধান অতিথি লবনহ্রদ পত্রিকার সম্পাদক সুধীর দে, বিশেষ অতিথিদ্বয় মথুরার শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠের অধ্যক্ষ বনমালী ব্রহ্মচারী, স্বামী অমৃতানন্দ মহারাজ এবং অছি সদস্য আশুতোষ গোস্বামী, অমিতাভ সেন প্রমুখ।

শোকসংবাদ

গত ২২ ফেব্রুয়ারি নবদ্বীপ শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক দেবেশচন্দ্র সান্যাল পরলোকগমন করেন। তিনি ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের পূর্বরেল কর্মচারী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা রাজ্য সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন দক্ষিণ কলকাতা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। স্ত্রী, ১ পুত্র ও পুত্রবধূ রেখে গেছেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পুরুলিয়া জেলার আদ্রা শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও বিজেপি-র একনিষ্ঠ কার্যকর্তা সুভাষ রায় গত ১ মার্চ, রবিবার পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন।

ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান-২০১৫

কলকাতা মহানগরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সামাজিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় আগামী ১ এপ্রিল ২০১৫, বুধবার বিকাল ৫টায় **ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান** অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কলকাতায় কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে। 'শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি'র রাষ্ট্রীয় সংযোজক **দীননাথ বত্রা**-কে এবছর সম্মান প্রদান করা হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক **মোহনরাও ভাগবত** অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

লয়েডের কালজয়ী দলই সর্বোত্তম

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

যত দিন যাচ্ছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের মান নিম্নগামী। আর এখন তো একদিনের ক্রিকেট পুরোপুরি ব্যাটসম্যান স্পেকট্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বোলারদের বধ্যভূমি। নানা নিয়মের জাঁতাকলে পড়ে পেস, স্পিন দু' ধরনের বোলিং আক্রমণই নির্বিষ হয়ে গেছে। বোলিংয়ের মানও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নামছে। আর তাই হরির লুটের মতো রানের বন্যা বইয়ে দিচ্ছেন মাঝারি এমনকী অতি সাধারণ ব্যাটসম্যানরাও। এই যখন অবস্থা, তখন ৭০/৮০ দশকের ক্লাইভ লয়েডের দুর্ধর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম যদি আজকের বিশ্বকাপে খেলত তাহলে কি ফল হোত? সহজেই অনুমেয়, সব কাপ আসবে তাদের অপ্রতিরোধ্য বিজয়রথের জয়পতাকা ক্রমশ আরো উঁচুতে উড্ডীন হোত। কি ছিল না সেই টিমের। ক্লাইভ লয়েডের মতো সর্বগুণসম্পন্ন অধিনায়ক, যিনি কিনা ব্যাটসম্যান হিসেবেও প্রয়োজনীয় নির্ভরতা দিতেন দলকে। লোয়ার মিডল অর্ডারে লয়েডের মতো ব্যাটসম্যান থাকা মানে একদিকে ধস আটকানো, অন্যদিকে রানের গতি তরতরিয়ে বেড়ে যাওয়া। তবে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের যা ব্যাটিং লাইন আপ ছিল, তাতে খুব কম ক্ষেত্রেই লয়েডকে উইকেট বাঁচিয়ে 'মিটঅ্যাঙ্কর' ভূমিকা নিতে হয়েছে। গর্ডন গ্রীনিজ, ডেসমন্ড হেইন্সের মতো রক্ষণ-আক্রমণের মিশেলে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ওপেনিং জুটি। শুরুতেই ঝড় তুলে বিপক্ষ দলের মনোবলকে দুমড়ে মুচড়ে ম্যাচের রাশ পকেটে পুরে ফেলতে সিদ্ধহস্ত ছিল এই জুটি। কী টেস্ট কী একদিনের ম্যাচ দু'ধরনের ক্রিকেটেই সর্বকালের অন্যতম সেরা ওপেনিং জুটি হিসেবে ক্রিকেটের বাইবেল উইজডেনে নিজেদের নাম ঢুকিয়ে ফেলেছেন গ্রীনিজ-হেইন্স। এরপর ব্যাট হাতে ক্রিজে আসতেন আলভিন কালীচরণ। অসাধারণ নান্দনিক ও কার্যকর বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান কালীচরণ, যিনি ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইন আপে এক বিশেষ মাত্রা নিয়ে এসেছিলেন। দুর্ভাগ্য ওয়েস্টইন্ডিজের, প্যাকার সিরিজ খেলতে চলে যাওয়ায় কালীচরণের সার্ভিস থেকে বঞ্চিত হতে হয়। মাত্র ৫/৬ বছর সরকারি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের হয়ে যে ক্রিকেটটা খেলে গেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই ক্লাসিকাল ঘরানার ব্যাটসম্যান, তা 'হল অব ফেমে' বাঁচিয়ে রাখার মতো। চার নম্বরে আসতেন 'গ্রেট মাস্টার' ভিভ রিচার্ডস। যিনি একাই প্রায় দু'দশক বিশ্বকাপ ক্রিকেটকে শাসন করে গেছেন ব্যাট হাতে। ভিক্টর ট্রাম্পার, ডন ব্রাডম্যান, এভার্টন উইকসের ঘরানার যোগ্য উত্তরসূরি ভিভ। তাঁর সময়ে যাঁরা বিপক্ষ দলের পেস, স্পিন আক্রমণে ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত উঁচু মানের বোলার ছিলেন। বব উইলিস, ইয়ান বোথাম, ডেনিস লিলি, জো টমসন, ইমরান খান, সরফরাজ নওয়াজ, রিচার্ড হ্যাডলি ও ভারতের বিখ্যাত স্পিনারত্রয়ী, কাউকেই রেয়াত করেনি ভিভের ব্যাট। ফাস্ট, স্পোর্টিং উইকেটে সব কীর্তিমান বোলারদের ক্লাবস্তরে নামিয়ে এনে রানের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন দেশে-দেশে। রিচার্ডসের পরে আসতেন লয়েড তারপর উইকেটরক্ষক জেফ দু'জন, যার ব্যাটের হাতও যথেষ্ট মজবুত ছিল। এই ব্যাটিং লাইন আপকে থামায় কার সাধ্য। আর ব্যাটসম্যানরা নিজেদের কাজটি সুসম্পন্ন করার পর বিপক্ষকে কচুকাটা করার জন্য লয়েড লেলিয়ে দিতেন তার ভয়ঙ্কর সুন্দর পেস ব্যাটারিকে। অ্যান্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিং, জোয়েল গার্নার, ম্যালকম মার্শালের মতো শাণিত, শক্তিশালী ও সুসংহত পেস বোলিং আক্রমণ বিশ্ব ক্রিকেট দেখেনি। এমনও হয়েছে কোনো ম্যাচে জবরদস্ত ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং হঠাৎ করে ফ্লপ করে গেছে। স্কোর বোর্ডে অল্প রান লয়েড কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকতেন তার চার মূর্তিমান ফাস্ট বোলার তার কমেই বিপক্ষকে শেষ করে দেবে। সব ধরনের পিচেই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল এঁদের। দীর্ঘ কয়েকবছর লয়েডের টিম যে দেশে-বিদেশে অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছিল তার পিছনে সিংহভাগ অবদান ছিল তার ফাস্ট বোলারদের। যতই উঁচু মানের ব্যাটসম্যানরা থাকুক না কেন তাঁর দলে, ব্যাটসম্যানরা ম্যাচ জেতায় না পারতপক্ষে। তাঁর ফার্স্ট বোলাররাই ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে গড়ে তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। তাই পরপর দু'টি বিশ্বকাপে অনায়াসলব্ধ জয় তুলে নিতে পেরেছিল তাঁর টিম। প্রথম দু'টি কাপ আসরে যে দাপট ও দক্ষতা নিয়ে ক্রিকেটের তিন বিভাগেই অতিমাত্রিক সুর-তাল- ছন্দের ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছিল ক্যারিবিয়ানরা তা পরবর্তীকালে কোনো চাম্পিয়নের খেলায় দেখতে পাওয়া যায়নি। শক্তি ও শিল্পের মিশেলে ১৯৭৫ ও ১৯৭৯-এর বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে কোনোকালের কোনো দলের তুলনা হতে পারে না, রেকর্ড যাই বলুক না কেন।

শব্দরূপ-৭৪০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

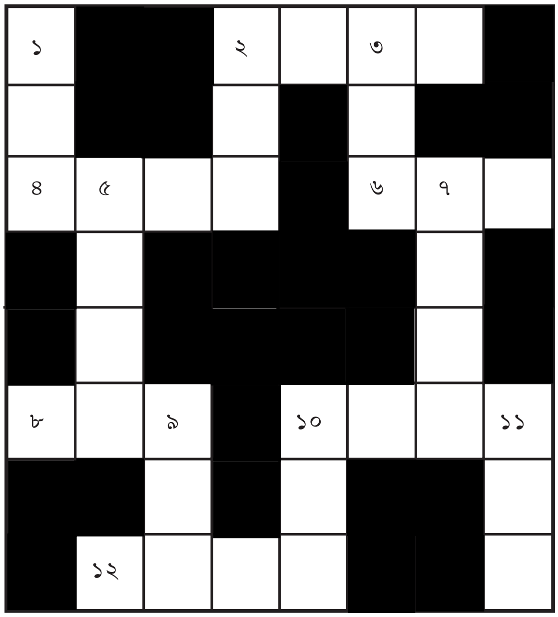

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. ঋষিবিশেষ, ব্যাসের পিতা, ৪. নর্তক শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ, ৬. দশমহাবিদ্যার এক, রাজারাজেশ্বরী, ৮. সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত, ১০. কোলাহল, ১২. কৃষ্ণ; প্রথম দুয়ে অরণ্য।

উপর-নীচ : ১. '—হরিদাস'; প্রাচীন গ্রীক ম্লেচ্ছজাতি, ২. ডাক্তার আর উকিলের প্রতিপত্তি এটা দেখলেই বোঝা যায়, ৩. শামুক; রাম কর্তৃক নিহত শূদ্র মুনি বিশেষ, ৫. তীক্ষ্ণ (ব্যঙ্গে, '—জ্ঞান, বুদ্ধি'), ৭. হনুমান; জৈন তীর্থঙ্কর বিশেষ, ৯. আলোকিতকরণ, ১০. চণ্ডিকা; অগ্নির সপ্তজিহ্বার এক, ১১. ইক্ষ্বাকুবংশের কুলগুরু প্রসিদ্ধ ঋষি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৩৭
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

হা	ড়	গি	লে		না	ল	ক
ত		মা	ঠে	ঘা	টে		র্মা
ছা	তু		ল	ট	র		র
নি	ন্দি	ত		লা	গু		
		খ	র		রু	সু	ম
ভ্রা		ত	স	লা		খ	দ
ম		না	ম	গা	ন		ক
ক	দ	মা		ম	ল	ম	ল

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

 ৭৪০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩০ মার্চ ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ১৮

স্বস্তিকা জাতীয় ভাবনার বাহক। সেই ভাবনা স্বস্তিকার মাধ্যমে যাঁরা প্রচার-প্রসারের কাজে যুক্ত তাঁরা স্বস্তিকার কার্যকর্তা।

আপনার এলাকায় স্বস্তিকার কার্যকর্তার নাম ঠিকানা

উত্তর ২৪ পরগনা

- **কৌশিক শাসমল**
সোনার পুর
৯১৪৩০৬৯৯৯৪
- **দিলীপ ময়রা**
কাশীনগর
৯৫৪৭৭৫৫৬৬৪
- **স্বপন খাটুয়া**
ক্যানিং
৮৯২৬৫১২৭২১
- **উৎপল হালদার**
শ্রীপুর, জয়নগর
৯৮৩০৬৭২৫২৬
- **শ্যামল কুমার দে**
বারুইপুর
৯২৩১৩২৬৪৮৭
৯৪৩৩৫০৫৯০৯
- **সুজিত সিংহ**
সোনারপুর নোয়াপাড়া
৯০৩৮৮৫৬৯৩৭
- **গৌরগোবিন্দ পট্টনায়েক**
কাকদ্বীপ
৯৭৩২৭৮১৫১৯
৭৩৮৪২৩৭১২২
- **ঝুলন হাওলাদার**
সোনারপুর
৮০১৭১২৩৫৪৪
- **আলোক রাজ**
মোহনপুর
৯০৬২৫৬৪৯০৫
- **মনোজ কুণ্ডু**
বাটানগর
৯১৬৩৯৬১৭৩১
- **সনৎ বসু, অজিত বসু**
রাজপুর
৯৩৩৯৯৩৯৬৩৭
- **তন্ময় মণ্ডল**
ডায়মন্ড হারবার
৯০০২২৯১৬০৬
- **শেখর মণ্ডল**
সোনারপুর
৯১৪৩৮৭৪২৯৬
- **দীনেশ মণ্ডল,** বজবজ
৯০০৭৬২৫৮২৩
- **সুজয় বিশ্বাস**
সুভাষগ্রাম
৯৮০৪১৭২৯৩২

মালদহ

- **পরেশচন্দ্র সরকার**
গাজোল
৯৬০৯৯২৭১০৬
- **প্রজেশ সরকার**
গাজোল
৯৬০৯৯২৭১০৫
- **সৌভিক মণ্ডল**
গাজোল
৯৮৫১৫৬৩৮৩৪
- **নির্মল কুমার নাথ**
নালাগোলা
৯৪৭৪৪৭১৪৩৭
- **স্বপন কুমার সাহা**
নাগেশ্বরপুর
৯৫৯৩৬০০৯৭৮
- **ধনঞ্জয় ঠাকুর**
কালিয়াচক
৯৭৩৫৯৩৬২৮৮
- **তরুণ কুমার পণ্ডিত**
কাঞ্চনতার
৮৭৫৯০৬৯১১১
- **কৃষ্ণচন্দ্র পাল**
শিবাজীনগর
৯৭৩৩১৯৭৪১৫
- **ডাঃ পরিমল দাস**
বীরনগর
৮৯২৭৪৪৭২১০
- **মন্টু সরকার**
ধুমাদীঘি
৮৬৭০৪০০৬৫৪
- **রাহুল সাহা**
মঙ্গলবাড়ি
৯৭৩২০২৮৮৯১
- **জীতেন্দ্রনাথ চৌধুরী**
শ্রীকৃষ্ণপুর
৯৮০০৪২৪৪১৭
- **পতিতপাবন বল্লভ**
মালদহ ২নং গর্ভঃ কলোনি
৯৭৩৩০০৫৮২৮
- **রথীন্দ্রনাথ সরকার**
বিদ্যাসাগরপল্লী
৯৪৭৪১৬৩৯৪১
- **তপন মণ্ডল**
মহেশমাটি
০৩৫১২-২৭৮২০২
- **গোপাল বসাক**
দক্ষিণ সিঙ্গাতলা
৯০০২৯৭০৪২৪
- **সৌমিত্রনাগর শর্মা**
ইংলিশবাজার
৯৮৫১২০৫৯৫৬

উত্তর মালদহ

- **শ্রীমতী বীথিকা দাস**
সামসী
৯৬৪৭৭০৯০৪৮
- **জয়শঙ্কর দাস,** কলিগ্রাম
৮৭৫৯৯৯৪৭৬৬
- **মলয় মুখোপাধ্যায়**
হরিশ্চন্দ্রপুর
৮৪৩৬১০৩১৮৫
৯৮৫১৬৯৩১০৪
- **সুব্রত দাস**
হরিশ্চন্দ্রপুর
৯৮০০৬২৯১২৩

দক্ষিণ দিনাজপুর

- **অরুণ কুমার মণ্ডল**
কুমারগঞ্জ
৮০১৬১৩৭১৪৮
- **অধীর কুমার দাস**
গঙ্গারামপুর
৭৭৯৭৯০৮৬১৩
৯৪৭৫৬৭৬৭৫৬
- **বলরাম দাস**
গঙ্গারামপুর
৯৯৩৩১৪৫৮২৫
- **তরুণ কুমার সরকার**
গঙ্গারামপুর
৯৯৩২৮১০৮৩১
- **বভ্রুবাহন মণ্ডল**
দৌলতপুর
৮২৯৩৪১৪৪৬৩
- **পিন্টু দাস (উদয় সরকার)**
বালুরঘাট
৯৪৭৪৪৩৫৩১০

উত্তর দিনাজপুর

- **ধীরেশ দেবশর্মা**
রায়গঞ্জ
৭৬৭৯৭৩০৫৮৮
- **সত্যসুন্দর সাহা**
কালিয়াগঞ্জ
৯৯৩২৫৯২৬৫৬
- **ভূদেব পাল**
ঈশ্বরপুর (ইসলামপুর)
৯৮৩২৩৩৪১৪৮
৮৯০০২২২৪৩০

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
9 March - 2015

দাম : ১০.০০ টাকা